# প্রথম অধ্যায়

## বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্পে প্রেমের জটিলতাময় বৈচিত্র্য

বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্পে প্রেমের বিচিত্র বিন্যাস নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর ছোট গল্পের মূল বিষয় যদি বলা হয় প্রেম তাহলে বোধ হয় ভুল হবে না। তার বিভিন্ন গল্পে বিচিত্র রূপে দেখা দিয়েছে প্রেমে আচ্ছন্ন, প্রেমে উন্মীলিত, উদ্ভাসিত, প্রেমের স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত, প্রেমের অপরিপূর্ণতায় বিষন্ন, প্রেমের পরীক্ষায় অসমর্থ নায়ক-নায়িকাদের বিচিত্র রূপ, তাদের জীবন কাহিনী যেমন বৈচিত্র্য তেমনই অপরিসীম। তারা কখনো সহচরী, কখনো জীবনসঙ্গিনী, কারো জীবনে প্রেমের উন্মেষ কখনো ঘটেনি, কেউ প্রেমে উৎসর্গিত, আবার কেউ প্রেমের কোলাহলে জর্জরিত স্মরণীয়। বুদ্ধদেব বসুর রচনার আদি মধ্য এবং অন্তে প্রেমের এই অজস্র রূপের নবনব আবিস্কার অন্তহীন। প্রেমের অন্বেষণই তাঁর রচনার মূল রস, আর তাঁর অশ্লীলতার খ্যাতিও এই কারণেই।

কথাসাহিত্যিকগণ সাধারণত তাদের রচনায় নানাভাবে প্রেমের দেউল গড়েন। আর যিনি প্রেমিক কবি তাঁর সাহিত্যের সংসারটি প্রেম নিয়ে শুরু আর প্রেম নিয়ে শেষ। নির্জনতার উপাসক বুদ্ধদেব বসু তাঁর গল্পের ভাণ্ডারে কেবলই প্রেমের রামধনু আকতে চেয়েছেন। সৌন্দর্য-তন্ময়তা সর্বদা তাকে ঘিরে আছে, তবু তাঁর গল্প উপন্যাস সম্পর্কে অশ্লীলতার অভিযোগ উঠেছে, নগ্ন সৌন্দর্য অনেকের কাছে শুধুই নগ্ন। 'যিনি দেহের বন্ধন ছিঁড়ে শূন্যতায়' উড়ে যেতে চান তাঁর রচনায় অশ্লীলতার গন্ধ যারা পান, তাঁরা শুদ্ধতার অর্থটিকেই খুঁজে দেখতে শেখেন নি।

'জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে 'কল্লোল' এ 'রজনী হ'লো উতলা' প্রকাশিত হয়েছিল,

তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প থেকেই বুদ্ধদেবের রচনা অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত। ''প্রজাপতির ডানার মতো কোমল দুটি গাল, গোলাপের পাপড়ির মতো দুটি ঠোঁট, চিবুকটি কী রমণীয় হয়ে নেমে এসেছে, চারুকণ্ঠটি কী মনোরম, অশোক গুচ্ছের মতো নমনীয়, স্নিগ্ধ শীতল দুটি বক্ষ — কী সে উত্তেজনা, কী সর্বনাশা সেই সুখ — তা তুমি বুঝবে না, নীলিমা। তারপর ধীরে ধীরে দুখানি বাহু লতার মতো আমাকে বেষ্টন করে ধরে যেন নিজেকে পিষে চূর্ণ করে ফেলতে লাগলো— তার সারা দেহ থেকে থেকে কেঁপে উঠতে লাগলো— মনে হলো আমার দেহের প্রতিশিরা বিদীর্ণ করে রক্তের স্রোত বুঝি এখুনি ছুটতে থাকবে।''[১]

এই অংশগুলি তখন অশ্লীল বলে গণ্য হয়েছিল। আসলে কল্লোল যুগের লেখকরা প্রায় সকলেই ছিলেন অতিরিক্ত রোমান্টিক। শরীরকে তারা প্রচণ্ড পরিমাণে সম্মান দিয়েছিলেন। তাঁরা যখন কোনো নারীর রূপের বর্ণনা দিয়েছেন, তখন মনে হয়নি সেটা কোনো মানবীর দেহ, সবাই যেন দেবী। এই অংশগুলি তখন অশ্লীল বলে গণ্য হয়েছিল। সুতরাং 'রজনী হলো উতলা' গল্পটিতেও বুদ্ধদেব দেবী রূপী নারী মূর্তি অংকন করেছেন। উক্ত গল্পটিতে নীলিমার দেহ সৌন্দর্য বর্ণনা করতে দেখি নায়ককে—

''আমি তার মাথাটি কাছে টেনে এনে তার ঐ মায়াময় চোখ দুটির উপর ঠোঁট রেখে নিঃশব্দে জবাব দিলুম। নীলিমার চোখ দুটি অবশেষে মুদিত হয়ে এলো। আমি এই অবসরে তার সারা দেহের উপর একবার ভালো করে চোখ বুলিয়ে গেলুম। অপরূপ! বিশ্বশিল্পী তাঁর কত স্নেহ, কত সুধা, কত মমতা দিয়েই না এই নারীদেহ গড়েছেন! এ যেন একটি বীণা— তা আপনা আপনি বাজে না— তাকে কোলে তুলে নিয়ে কোনো সুররসিক সুরসাধনা করবে এই তার সার্থকতা। আমি

আর পারলুম না। সন্তর্পণে ওকে একেবারে বুকের কাছে টেনে তুলে নিয়ে বিপুল আবেগে জড়িয়ে ধরলুম।”[২]

গল্পটি ‘কাল্লোল’-এ ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেও তাঁর বিরুদ্ধে অশ্লীলতার বিচিত্র অভিযোগ ওঠে নানাদিক থেকে। তখনকার খ্যাতনামা লেখিকা বীণাপানি দেবী নিঃসঙ্কোচে জানালেন, ‘এইসব অতি আধুনিক লেখককে আঁতুরেই নুন খাইয়ে ফেলা সংগত ছিল’। অন্য আরেক মহিলার মত ছিল! ‘লেখক যদি বিয়ে না করে থাকে তবে যেন অবিলম্বে বিয়ে করে, আর বউ যদি সম্প্রতি বাপের বাড়িতে থাকে তবে যেন আনিয়ে নেয় চটপট।’ অশ্লীলতার অভিযোগ বুদ্ধদেবকে সমস্ত জীবন বিদ্ধ করেছিল। তাঁর গল্প-উপন্যাস-কবিতা সব কিছুতেই এই অভিযোগ উঠেছিল। ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হল বুদ্ধদেব বসুর প্রথম উপন্যাস ‘সাড়া’। এবং সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া তুলল, বুদ্ধদেবের নিজের ভাষায়। ১৯৩০-এর যুগের বিপ্লবী লেখকের রচনা পড়লে মনে হয় অতি প্রাচীন কোন সংস্কৃত কবিতার অনুবাদ। এমনকি বুদ্ধদেব বসুর বিখ্যাত কবিতা ‘বন্দীর বন্দনা’ পড়লেও একথা মনে হয়—

‘বাসনার বক্ষমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।
রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষবর্ষ উপবাসী শৃঙ্গারের হিয়া।
রমণীয় রমণ রণে পরাজয় ভিক্ষা মাগে নিতি।’

এইসব কবিতাও তখন অশ্লীল বলে গণ্য হয়েছিল জেনে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। বস্তুত বুদ্ধদেব অতি রোমান্টিকতায় যৌনতাকে দূরেই সরিয়ে রেখেছিলেন। নবীন লেখকদের রচনায় অশ্লীলতা বিতর্কে রবীন্দ্রনাথকেও জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। ‘শনিবারের চিঠি’র একটি বিভাগে তরুণ লেখকদের রচনায়

বিশেষ বিশেষ অংশ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ছাপা হয়েছিল— এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বিচিত্রা ভবনে দু'দিন ধরে একটি সভা হয়। রবীন্দ্রনাথই ছিলেন মুক্ত বক্তা। সেখানে তিনি জানিয়েছিলেন— 'সাহিত্যিক অপরাধের বিচার সাহিত্যিকভাবেই হওয়া উচিত। অর্থাৎ রচনাকে তার সমগ্রতার দিক থেকে দেখতে হবে। ... যা মনকে বিকৃত করে সেগুলিকে সংগ্রহ করে সকলের কাছে প্রকাশ করলে উদ্দেশ্যের বিপরীত দিকে যাওয়া হয়।'

বুদ্ধদেব শুধু সাহিত্যগতভাবে মোকাবিলা করেই কিন্তু অশ্লীলতা প্রসঙ্গ থেকে মুক্তি পাননি। পুলিশ-আইন-আদালত পর্যন্ত জড়িয়ে গিয়েছিল এই ব্যাপারে। পরে, তাকে জেলও কাটতে হয়েছিল। যে বয়সে বুদ্ধদেব বসু গল্পটি লিখেছেন তখন তিনি নিতান্তই তরুণ। কবি তাঁর রোমান্টিক ভাবনায় নর-নারীর চরম আসঙ্গ লিপ্সা ও তা থেকে বেরিয়ে আসার উপযোগী প্রেম-ভাবনার সূক্ষ্ম সুন্দর দিক দেখিয়েছেন এ গল্পে। 'রজনী হলো উতলা' গল্পের প্লট পরিকল্পনায় নিটোল কাহিনী নেই।

এই গল্পটির বুদ্ধদেব বসুর একটি অন্যতম গল্প। বুদ্ধদেব বসু; গল্পটি শুরু করেন 'মেঘনার ঘোলা জল দিয়ে'; যদিও মেঘনার এই ঘোলা জল বেশিক্ষণ স্থির থাকেনি। গল্পটিতে তিনি অবতরণ করেছেন আধো ছায়া-আধো অন্ধকার, যা গল্পটিকে এগিয়ে নিয়ে যায় সামনের দিকে। মেঘনার জলকে তিনি দেখেছেন সৌন্দর্যময় দু'চোখ দিয়ে। মেঘনার রূপের বর্ণনা দেন এভাবে : ''মেঘনার ঘোলা জল চিরে স্টিমার সামনের দিকে চলছে; তার দু'পাশের জল উঠছে, পড়ছে দুলচে— তারপর ফেনা হয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে, জলকন্যার নগ্ন দেহের মতো শুভ্র, দ্রাক্ষারসের মতো স্বচ্ছ। একদিকে তরু পল্লবের নিবিড় শ্যামলিমা, অন্যদিকে

দূরদিগন্ত রেখার অস্পষ্ট নীলিমা।”[৩] এটি গল্পের শুরু হলেও এর মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবে রয়েছে কবিতার ছাপ। কিছু শব্দকে না সরিয়ে এটাকে যদি বলি কোন গদ্য কবিতার রূপ তাহলেও হয়তো ভুল হবে না। গল্পের কয়েকটি স্থানে কবিতার রূপ দেখি আরও গভীরভাবে। ‘জলকন্যার নগ্ন দেহের মতো শুভ্র’; ‘তরু পল্লবের নিবিড় শ্যামলিমা’ এবং ‘দূর দিগন্তরেখার অস্পষ্ট নীলিমা’। এই শব্দগুলোকে পঙক্তির পর পঙক্তি সাজালে হয়তো রূপ পাবে একটি অপরূপ কবিতার। যা দেখে আমাদের আর মনে হবে না কবিতার মতো করে চয়ন করা হয়েছিল তার ভাষা। যে ভাষা সম্পূর্ণ নয়; তার গায়ে ছাপ লেগেছিল কবিতার অপরূপ সৌন্দর্যবোধের। যা রূপ পেতে পারতো একটি তাৎপর্যময় কবিতার। যে কবিতা হয়ে উঠতো শুধুই কবিতা অন্য কিছু নয়। এগোনো যাক গল্পের আরও একটু গভীরে ‘এই মাত্র সূর্য অস্থ গেলো। আমাদের সামনে পুব দিক-সন্ধ্যারানীর লাজনম্র রক্তাভ মায়াটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছিনে— আমরা দেখছি খুব মস্ত এক টুকরো আকাশ-কুয়াশার মতো অস্পষ্ট; তার রংটা ঠিক চেনা যাচ্ছে না— মনে হচ্ছে, কে যেন তার মুখ দেখে সমস্ত রঙের ছোপ মুছে নিয়েছে অমন বিবর্ণ, বিশ্রী ম্লান চেহারা আমাদের দেশে আকাশের বড়ো একটা হয় না’। বুদ্ধদেব বসুর ‘রজনী হলো উতলা’ গল্পটিতে রয়েছে কবিতার ভাবও তার সংমিশ্রণ। আমরা পূর্বেই জেনেছি, কবি যখন কোনো গদ্য রচনা করে সেখানে ছায়ার মতো লেগে থাকে ভাব-ভাবনা, শব্দ, রূপ এবং বাক্যর ব্যবহার। এখানেও তার ব্যতিক্রম নয়। গল্পের অংশ বিশেষে আমরা যেমন লক্ষ্য করি; ‘সন্ধ্যারানীর লাজনম্র রক্তাভ মায়াটুকু’, ‘টুকরো আকাশ কুয়াশার মতো অস্পষ্ট, ‘কে যেন তার মুখ দেখে সমস্ত রঙের ছোপ মুছে নিয়েছে’ কিংবা ‘ম্লান চেহারা আমাদের দেশের’ মতো বাক্যগুলো। যা গল্প থেকে যেন কবিতায় স্বাক্ষর

রাখে বেশি।

বুদ্ধদেব বসু; গল্পটি বলেছেন নিজের মতো করে। এগিয়ে নিয়েছেন গল্পটির কাহিনী তার গভীর থেকে আরও গভীরে। 'আমরা দু'জন পাশাপাশি ডেক-চেয়ারে বসে আছি, কারো মুখে কথা নেই'। কে এই দু'জন? কি সম্পর্ক তাঁদের? তা সহজেই প্রকাশ করেননি বুদ্ধদেব। এগিয়েছেন তাঁদের নিয়ে এবং তাঁরা যেন থেকে যায় অধরা। আধো ছায়া-আধো অন্ধকারের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন গল্পটিতে। এখানে বুদ্ধদেবকে এক গল্পকারের থেকে এক স্বাপ্নিক-ই বেশি মনে হয়। যিনি শুধু আমাদের স্বপ্নই দেখিয়ে যাবেন, যতক্ষণ না আমাদের চেতন ঘটে তার অভ্যন্তরে যাওয়ার জন্য। গল্পটিতে আবার যখন বলেন, ''আমি মুখ ফিরিয়ে ওর চোখের দিকে চাইলুম-আশ্চর্য! ওর চোখে কোনো রং আমি আজ অবধি ঠিক করতে পারলুম না। ও যেন ক্ষণে ক্ষণে বদলায়, কখনও সন্ধ্যার এই ছায়াটুকুর মতো ধূসর, কখনও ঐ সুদূর তারকার মতো সবুজ, কখনও ঐ নদীর জলের মতে কালো, কখনও দিগন্তরেখার অপরূপ ভঙ্গিমার মতো নীল।''[৪] 'ওর' সম্পর্কিত ব্যক্তিটিকে আমরা কখনও চিনে উঠতে পারিনি। কি সম্পর্ক তাঁদের দু'জনের, তা আমরা অতি সহজে জানতে পারি না। আমাদের মাঝে তা থেকে যায় অজ্ঞাত। প্রেমিক-প্রেমিকা, ভালোবাসর মানুষ, স্বামী-স্ত্রী কিংবা এসব ব্যতিরেখে অন্য কোনো সম্পর্ক, যা শুধু চরিত্রের কথক হিসেবে এগিয়ে নিয়ে যাবে মূল গল্পটি। গল্পটিতে রয়েছে স্বপ্ন ও তার বাস্তবতার মিশ্রণ। যে স্বপ্ন যেনো দেখা দিচ্ছে তো দিচ্ছে না; ধরা দিচ্ছে তো দিচ্ছে না, তারপরও বুদ্ধদেব এগিয়ে নিয়ে যান গল্পটিকে। বুদ্ধদেব বসু, গল্পটিকে নিয়ে গেছেন গভীর থেকে আরও অনেক গভীরে। গল্পটিকে গভীরে নিয়ে যাওয়াই যেনো তার লক্ষ্য ছিল। যেখানে তিনি আবেদন ছড়াবেন মুগ্ধমনে এবং বেজে

উঠবে যেনো এক আপন সুর। যে সুর বুদ্ধদেব বসুর কণ্ঠস্বরের সাথে একাত্ম হয়ে বেজে উঠবে আপন মনে।

মেঘনার ঘোলা জলকে তিনি দূরে সরিয়ে বেশ কিছুটা এগিয়েছেন। পাশাপাশি বসে থাকা ব্যক্তি দু'জনের সম্পর্কের দিকটাও কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে। একজনকে আমরা চিনে উঠতে পারি, তিনি 'নীলিমা' যদিও এই নামটি আমাদের কাছে আর নতুন মনে হয় না। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় এই নামটির সাথে আমরা পূর্বেই পরিচিত ছিলাম। উভয় ব্যক্তি সম্পর্ক দিকটি আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে গল্পের ভিতর এগোনো মাত্র। বুদ্ধদেব বসু গল্পের এক স্থানে এসে যখন প্রকাশ করেন 'নীলিমা মাথাটা একটু পেছন দিকে হেলিয়ে বললে, আচ্ছা তোমায় আবার দোষ দেব! তুমি যে আমার বর'। আমাদের আর কোনো অজানা থাকে না উভয় ব্যক্তি সম্পর্কটি। ছয় বছর পূর্বে ঘটে যাওয়া নিজের জীবনের ঘটনা আবার ফিরে আসে গল্প হয়ে। আসে তা আবার অতীতের গল্প হয়ে। বাস্তবিক রূপ নয়; তা হয়ে উঠে এক কৈশোরিক প্রেমে, যে প্রেম বেশি দূর আর এগোয় না। এবং তা রূপ নেয় যৌবনের কাঁচা রঙের। সেই প্রেম অবস্থান করে বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে। 'রজনী হলো উতলা' গল্পে বুদ্ধদেব বসু গল্পের প্রেক্ষাপটে প্রকাশ করেন নারী নিয়ে একটি উক্তি। গল্পের ভিতরে তিনি প্রকাশ করেন : 'পৃথিবীর অনেক কিছুই তখন আমার কাছে রহস্যময়, আর তার মধ্যে সবচেয়ে রহস্য হলো নারী'। এই নারী শারীরিক প্রাপ্তির কোনো নারী নয়; এই নারী বাস করে মনের গভীরে এক স্বপ্নের মাঝে, যে আমাদের শুধু নিয়ে যায় সেই স্বপ্নের মাঝে, যেখানে তার উজ্জ্বল উপস্থিতি রয়েছে। তার শাড়ীর আঁচল, চুড়ির শব্দ বা তার ছায়া-ই শরীরে কাপন জাগায়। গল্পের ভিতর আবার ফিরে আসে

সেই নদী, যে নদীর দিকে মুখ করে বসেছিলেন তারা। ভাবনা ও কল্পনায় তারা আসে স্বপ্নের ভিতর। যাদের দেখে তিনি প্রকাশ করেন হৃদয়ের গভীরে লুকিয়ে থাকা অব্যক্ত বাণী; যে বাণীর শ্রোতা তারা ছাড়া অন্য কেউ নয়। আপন মনে বলে উঠেন 'অমরাবতীর দুয়ারে জ্যোতির্ময়ী ঊষার লালাটের শিশির বিন্দু'। গল্পের কথক হয়ে যখন বলতে থাকেন গল্পটি, কিন্তু নিজেই আবার হৃদপিণ্ড কেপে প্রকাশ করেন পাশে বসে থাকা সেই নারীর ভালোবাসার শ্রুতিময় বাক্য, যেখানে নিজেকে আর অন্য কেউ মনে হয় না, মনে হয় যেন একান্ত ভালোবাসার মানুষ। অতীতের সেই চমৎকার সম্পর্কের ভাবনাবোধটি কিছুক্ষণের জন্য হলেও স্থিতি হয়ে রয়। বাড়তে থাকে পাশে বসে থাকা মানুষটির গল্প ভাবনা। বুদ্ধদেব বসু গল্পের এক প্রান্তে এসে আবার বলে উঠেন : 'মনে হলো, যেন আমি জ্বলের নিচে ডুবে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ উঠে এসে আবার নিঃশ্বাসের সঙ্গে বাতাসের অমৃত সেবন করছি। চেয়ারের হাতলের উপর ঝুকে পড়ে তার মুখের অত্যন্ত কাছে মুখ নিয়ে বললুম, আঃ এই যে তুমি নীলিমা! এতো কাছে! আমি তোমার কেশের সৌরভ পাচ্ছি, তোমার নীল চোখ দুটির মধ্যে আমার নিজের চোখের ছায়া দেখতে পাচ্ছি। আমার আর ভয় নেই-আঃ নীলিমা, তুমি কত সুন্দর'। যে স্থানে বা বাড়িতে কেটেছিল নিজের জীবনের কিছু সময়। সে সময়টা কেমন কেটেছিল? কি কল্পনা ছিল সেই ভাবনার জগতে? একজন কবি, পরে একজন গল্পকারের ভাবনায় সেই বাড়ি বা গৃহটি ছিল যেন এক রূপের মেলা। বুদ্ধদেব বসু গল্পের মাঝে আবার বলে উঠেন : 'ও বাড়ি তো নয়, যেন রূপের মেলা যেন ফুলের বাগান! তাতে কত ফুল ফুটে রয়েছে— তারা রূপের জৌলুশে চাঁদনি রাতকে হার মানিয়ে দেয়, সৌরভের মাদকতায় বাতাসকে মাতাল করে তোলে! বলেইছি

তো, আমার সেই সদ্য জাগ্রত অসীম তৃষ্ণা নিয়ে আমি তাদের মধ্যে গিয়ে পরলুম। পড়ে হঠাৎ যেনো জীবন সূত্রের খেই হারিয়ে ফেললুম'। সেই সন্ধ্যা, সেই বাড়ি, সেই মানুষগুলো সবই যেন এক কল্পজগত তৈরি করেছিল গল্পটিতে। এটা যেন কোনো গল্প নয়; বাস্তবতার এক বহিঃপ্রকাশ। যা ঘটে গিয়েছিল বুদ্ধদেবের জীবনে।

গল্পটির শ্রোতা একজন নারী। যিনি সম্পর্কে তাঁর-ই-স্ত্রী। বলে যাচ্ছেন পুরুষটির জীবনের মেঘের মতো উড়ে যাওয়া কিছু ঘটনা। গল্প বলাতে কোনো ক্লান্ত নেই; তিনি শুনতে চাচ্ছেন যা ঘটে গিয়েছিল পুরুষটির জীবনে। গল্পের মধ্যে আবার বলে উঠেন : 'গলার স্বর হঠাৎ নামিয়ে ফেলে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করলুম, আরো শুনতে চাও? নীলিমা রুদ্ধস্বরে জবাব দিলো— চাই'। জমাটবদ্ধ মেঘের মতো ঘটনা; তা যেন বৃষ্টির ফোঁটার মতো ঝরে পড়ে। এবং খেলা করে এক আলো ছায়ার লুকোচুরি। সেই গৃহের বর্ণনা আবার ফিরে এসে গল্পের শরীর জুড়ে। বুদ্ধদেব আবার তা প্রকাশ করেন নিজের মতো করে। বলে উঠেন : 'অমনি আমার ঘরের পর্দা সরে গেলো। ঘরের বাতাস মূর্ছিত হয়ে পড়লো, আমার শিয়রের উপর যেন একটু চাঁদের আলো পড়েছিল, তা যেন একটু নড়ে চড়ে সহসা নিবে গেলো, আমার সমস্ত দেহ মন এক স্নিগ্ধ অবসাদে শ্লথ হয়ে এলো, আমি যেন কিচ্ছু দেখছি না, শুনছি না, ভাবছি না, এক তীব্র মাদকতার ঢেউ এসে আমাকে ঝড়ের বেগে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো তারপর!'

'তারপর', তারপর আর কি ঘটে তা আমাদের জানান নি। থেমে যান এখানে। বুঝে নিতে হয় আমাদের গল্পের বাকি ঘটনাগুলো। যে ঘটনাগুলো শুনার

জন্য অপেক্ষা করে আছেন গল্পের সেই নারী। যে প্রথম থেকে রয়েছে গল্পের শ্রোতা হয়ে। তিনি বার বার শেষ করবেন বলে গল্পটি আর শেষ করেন না। অপেক্ষায় থাকে গল্পের সেই নারীটি, এবং সেই সাথে আমরা। যা ঘটেছিল ওই গৃহে বহু পূর্বে, তা আবার সত্য মিথ্যা হয়ে দেখা দেয়। যা ঘটেছিল তা কি শুধুই স্বপ্ন। যেভাবে বুদ্ধদেব বসু গল্পের মাঝে নিজেকে উপস্থাপন করেন, কিন্তু আজকে কিছুই সত্য বলে আমাদের আর মনে হচ্ছে না। সব ছায়া, বাসি ফুলের মতো ম্লান, অশ্রুপূর্ণ চোখে দেখা জিনিসের মতো ঝাপসা। যে ঝাপসা শুধু আচ্ছন্ন করে না, নিয়ে যায় অতীত চিন্তার জগতে। যে ভাবনা বা স্বপ্ন নিয়ে বুদ্ধদেব বসু এগিয়ে যান সামনের দিকে। স্বপ্নের সেই সব নারী, যারা কখনও ধরা দেয় না; তারা থেকে যায় স্বপ্নের মাঝে।

গল্পটিতে দেখি নায়ক তার নায়িকার কাছে নিজের পূর্ব জীবনের প্রেম অর্থাৎ দেহ লালসার কথা কাহিনী স্বরে বলছে। গল্পটিতে কবিকৃত এক রোমান্টিক পরিবেশে দেহ নির্ভর প্রবৃত্তির উন্মাদনায় উন্মত্ত এক যুবক প্রতি রাতের মোহময় অন্ধকারে নিজের অজান্তেই এক একটি নারী সঙ্গ করে। নাম জানে না এই নায়ক সেই সব রমণীর। চরম সম্ভোগের শেষে যুবক নায়ক তার নাম জানতে চাইলেও দেহদাত্রী নায়িকাটি নাম বলে পরিচয় দিয়ে যুবকের কাছে ধরা দিতে একান্ত অনীহ। যুবক নায়কের আগ্রহ এতে স্তিমিত হয় ও তার প্রেম বাসনার প্রকাশে পড়ে বাধা। শরীরের সীমায় তাই ভোগের যে দূর্দান্ত রূপ, তা তাকে নিয়ত ক্লান্ত করে, আনে এক মনস্তাত্ত্বিক অসুস্থতা। তারপর তার জীবনে সত্যিকারের প্রেমের জাগরণ ঘটে, নায়িকা নীলিমাকে নিয়ে সে ঘর বাধতে চায়। নিরন্তর ভোগের অন্ধকার থেকে চিরন্তন প্রেমের আলোয় নিজেকে দেখার বাসনা জাগে মনে। তাই সে নীলিমার

হাত ধরে সেই অন্ধকারের তলা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে চায়। তাই গল্পশেষে মনে এক সুন্দর প্রেমজীবনের ইঙ্গিতময়তা নিয়ে আসে।

প্রেমের কথালাপ, অফুরন্ত শৃঙ্গার, অন্তিম দেহভোগের যে চিত্র এ গল্পে ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত তাতেই সেকালে ওঠে সোরগোল, কারণ ঠিক এ জাতীয় যৌন-ক্রিয়ার বর্ণনা বাংলা গল্পের ধারায় ছিল অদৃষ্ট।

নারী ও পুরুষের সম্পর্কের পরিণতি কোথায়; কোথায় তার নিয়তি বা নির্ভরতা, তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে গল্পটিতে। নারী পুরুষের মাঝে যে সম্পর্ক রয়েছে তার ব্যাপক ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সমস্ত সাহিত্য জুড়ে। তাঁর কিছু ভাবনা আবার আমরা দেখতে পাই বুদ্ধদেব বসুর ক্ষেত্রে। যার ব্যাপক ছাপ রয়েছে এই গল্পটিতে। নারী, শারীরিক না মানসিক তা বড়ো হয়ে দেখা দেয় না গল্পটিতে; বরং দেখা দেয় নারীর উপস্থিতি। তাই বুদ্ধদেব বসু এই গল্পে যখন বলে উঠেন, 'নারীর মুখ কি শুধু দেখবার জন্যই? তাঁর উত্তর আবার যখন ফিরে আসে, 'তা যে অফুরন্ত সুধার আধার'। যে সুধা বুদ্ধদেব বসু পান করতে চেয়েছেন ধীরস্থির ভাবে এবং ক্ষণে ক্ষণে। যেনো তিনি বার বার ফিরে আসেন সেই একই পাত্রে। গভীর ভাবনাবোধ যেনো সব কিছুকে এক নিরবতায় আচ্ছন্ন করে ফেলে। কোনো শব্দও যেনো তাকে আর ভাবিত করতে পারে না। যার উপস্থিতি আমরা দেখতে পাই বুদ্ধদেব বসুর এই গল্পটিতে। গল্পটিতে তিনি বলেন, 'স্টিমারটির কি বিশ্রী শব্দ করছে। ও কি অনন্তকাল ধরে চলতেই থাকবে? কোনোখানেই কি থামবে না?' এ শব্দ ব্যতিক্রম কোনো শব্দ নয়। সর্বদা যে রকম শব্দ হয় এটা তার-ই প্রকাশ। কিন্তু তারপরও এই রকম শব্দটা 'বিশ্রী' হয়ে দেখা দেয়। যে শব্দ যেন আর শব্দ নয়; তা যেন নিরবতার বিচ্ছিন্নতা। যে নিরবতা যেন কোনো কবির

বহিঃপ্রকাশ। পরের আরেকটি কথার প্রকাশ 'অনন্তকাল ধরে চলতেই থাকবে?' এ প্রশ্নের কোনো উত্তর আমাদের জানা নেই। কারণ কোনো কিছুই আর অনন্তকাল ধরে চলতে পারে না। সেটা যেমন সত্য, তার চেয়ে আরও আশ্চর্য হতে হয় এ রকম প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে। এই অনন্ত প্রবাহমান হওয়া কি শুধু মাত্র স্টিমারের ক্ষেত্রেই হয়ে দেখা দেয়; না, তার দ্বারা তিনি আমাদের দেখাতে চেয়েছেন জীবনের প্রবাহকে? যে প্রবাহে বুদ্ধদেব বসু শুধু নিজেই নয়; গল্পটিকে নিয়েছেন আরও গতিশীল করে। এর কিছুক্ষণ পরে আবার যখন বলেন, 'কোনো খানেই কি থামবে না?' এ রকম প্রশ্ন বা ভাবনা শুধু বুদ্ধদেবকে নয়; আরও চিন্তিত করে তোলে আমাদেরকেও।

বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হলো উতলা' গল্পটিতে স্ত্রী নীলিমাকে গল্পকথক বলছিলেন তার ঘটে যাওয়া জীবনের কাহিনী। গল্পটি তিনি বলতে থাকেন থেমে থেমে। গল্পটির অন্তরে রয়েছে কবিতার ছাপ। যেমন আমরা দেখতে পাই, 'জলতরঙ্গের মতো মিস্টি সুর, ওদের হাসির রোল ঘরের শান্ত হাওয়াকে আকূল করে ছুটতে লাগলো, হাত নাড়াবার সময় ওদের বালা চুড়ির মিঠে আওয়াজ রোজকার মতোই সেজে উঠলো, সবাকার মুখই ফুলের মতো রুপময়, মধুর মতো লোভনীয়! কিন্তু আমার কণ্ঠ মৌন, হাসির উৎস অবরুদ্ধ'। বুদ্ধদেব বসু গল্পটিতে প্রকাশ করতে চেয়েছেন এক অস্থির ভাবনা। স্থির থাকেননি গল্পের কোনো একক স্থানে। নারী অভিব্যক্তির ভালো লাগা দিকগুলো গল্পটিতে ফিরে আসে বার বার। যা ঘটে গিয়েছিল গত রাতে তা আর নতুন করে ফিরে আসবে আজকে? এ রকম ভাবনা সর্বদা কাজ করে বুদ্ধদেব বসুর মাঝে। অকুণ্ঠে প্রকাশ করেছেন নিজের ভাবনার চরম দিকটি। কখনও নিজের মাঝে প্রকাশ করেছেন হয়তো তা ঘটবে বা

পরক্ষণে বলেছেন তা ঘটবে না। এ রকম দ্বন্দ্ব আমরা দেখতে পাই সম্পূর্ণ গল্পটি জুড়ে।

বুদ্ধদেব বসু গল্পটি নিজের মতো করে বলতে চেয়েছেন। এতক্ষণ গল্পটি যাকে বলে আসছেন তিনি যদি আর গল্পটি শুনতে না চান তার জন্য নিজের মাঝে এক প্রকার দ্বন্দ্ব কাজ করে। তাই পাশে থাকা নারীটিকে বলে উঠেন : 'নীলিমা, এতোখানি যখন শুনলে, তখন দয়া করে বাকিটুকুও শুনবে না কি? এইটুকু দয়া আমায় করো, নীলিমা'। আমরা সর্বদা দেখেছি গল্প শোনার জন্য মানুষ অনুনয় করে; আর তার ব্যতিক্রম দেখতে পাই বুদ্ধদেব বসুর এই গল্পটিতে। যেখানে গল্প বলার জন্য কথক অনুনয় না বিনয় প্রকাশ করেন। কি আছে সেই গল্পের মাঝে যা তিনি বলার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়েন!

গল্পের শেষের দিকটিতে রয়েছে এক অসমাপ্ত ভাব। যা আমাদের আর পূর্বের ন্যায় আকর্ষণ করে না। মন ও মগজে আমরা যখন স্থির করে নিই গল্পটিকে বুদ্ধদেব বসু তখন বলে উঠেন : 'দেশে ফিরে এসে শুনলুম, সে রাতে আমার কপাল ফেটে রক্ত পড়ে কার্পেট ভিজে গিয়েছিলো, ঐ অজ্ঞান দু-দিন ছিলুম। সারাক্ষণ এতো দুর্বল ছিলুম যে, ডাক্তাররা আশঙ্কা করছিলেন যে কোন সময়ে আমার হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আমার জ্ঞান হারানোর জন্যও নাকি ভয়ানক শারীরিক দুর্বলতা আংশিক রূপে দায়ী! তাছাড়া মানসিক উত্তেজনা ও স্নায়বিক দুর্বলতা আমার শরীরকে নাকি এমনভাবে ভেঙে দিয়ে গিয়েছিল যে, আর একটু হলেই একেবারে হাড়গোড় সুদ্ধ চুরমার হয়ে যেতুম। ধীরে ধীরে সেরে উঠলুম। মনটা যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো, তখন সেই অপরিচিতাকে জানাবার জন্য সহস্র চেষ্টা করতে গেলুম, কিন্তু সমস্ত ছল, সমস্ত কৌশল ব্যর্থ

হলো। কিছুতেই কোনো দিশে করতে পারলুম না। আজ পর্যন্ত পারিনি'। বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হলো উতলা' গল্পটিতে রয়েছে আধো বাস্তব আর আধো কল্পনার এক অভূতপূর্ব সমন্বয়। যে দুটিকে নিয়ে এগিয়ে যায় গল্পটি। এক মনোমুগ্ধকর যাদুর স্পর্শ দিয়ে তিনি আমাদের নিয়ে যান গল্পের অভ্যন্তর থেকে আরও অভ্যন্তরে।

বুদ্ধদেব বসু 'আবছায়া', 'জয়জয়ন্তী', 'তুমি কেমন আছো' প্রভৃতি গল্পেও প্রেমের বিচিত্র বিন্যাসের বিভিন্ন দিক ফুটিয়ে তুলেছেন। 'আবছায়া' গল্পে অপর্ণার সঙে গল্পের নায়কের প্রেমের নম্র ও অনুভূতি প্রবণ সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়।

অপর্ণা, কথক ও অশোক— এই তিন চরিত্রের প্রেম-অন্তর্বাস্তবতার দ্বন্দ্ব নিয়ে গল্প 'আবছায়া'। গল্পের প্রধান চরিত্র অপর্ণা, তাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে সমস্ত ঘটনা। অপর্ণা, কথক ও অশোক— এই ত্রিভুজ প্রেমের দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েনের কাহিনী এটি, কথক এখানে মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি। ধরা যায় অপর্ণা নিজেও মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। অশোক ধর্নাঢ্য ঘরের সন্তান। গল্পের বয়ানে ও বিভিন্ন পর্যায়ে এই সব চরিত্র নানাভাবে উন্মোচিত হয়েছে। যেহেতু গল্পের কথক মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি, তাই গল্পে তার চরিত্রেরই ছাপ পাওয়া যায়। তাই বলে কোনো চরিত্রের প্রতি অবজ্ঞা করা হয়েছে, এমনটা বলা যায় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এটা একটা সাধারণ ঘটনা হিসেবে ধরা যায়। সাধারণ ঘটনাকেই বেছে নিয়েছেন গল্পকার। সে সময়ের গদ্য শৈলির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, মানুষের বাহ্যিক-পারিপার্শ্বিক অনুপুঙ্খ বর্ণনার চেয়ে অন্তর্জীবনের গভীরতর বাস্ততার রূপায়ণ, চরিত্র চিত্রণের পরিবর্তে তার ভেতরকার স্বরূপ আকর্ষণ, অবচেতন মনের

আন্তঃসংলাপ, অবদমিত মনের প্রকাশ ভঙ্গি খোজার চেষ্টা করা হয়েছে। 'আবছায়া' গল্পেও আমরা তার প্রয়োগ দেখি। সাধারণ একটি ঘটনা বর্ণনা আর উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে গল্পটি অসাধারণ হয়ে ওঠেছে। গল্পের প্রধান বিষয় ব্যক্তির ভেতরকার দ্বন্দ্ব। প্রথম থেকেই আমরা এই দ্বন্দ্ব টের পাই। অপর্ণার কাছে কথকের যাওয়া না যাওয়া, যে ছুঁই-ছুঁই-ছুঁই না ধরনের সম্পর্ক-অবস্থা-অবস্থান, যা আমাদের মনে ক্লাইমেক্সের জন্ম দেয়। আমরা অপর্ণার সঙ্গে কথকের ভাল লাগা 'হাত বাড়িয়ে ছুঁই না তোকে, মন বাড়িয়ে ছুঁই/ দুইকে আমি এক করি না, এককে করি দুই' ধরনের। ফলে সম্পর্কের পরিণতি কি হয়, তা দেখতে চাই। দেখতে চাই অপর্ণা সঙ্গে কথক কখন মুখোমুখি হয়, কিংবা আদৌ কি হয় না। হলে তাদের মধ্যে আবেগের সঞ্চার কেমন হয়, তারা কিভাবে তাকে নিয়ন্ত্রণ বা প্রকাশ করে। তাদের মানসিক, শারীরিক অবস্থা কি হয়। তাদের ভাষা, বক্তব্যই বা কি হয়— ইত্যাদি।

বিএ ক্লাসে দুইশত ছাত্রের কালো কালো মাথা ডিঙিয়ে যখন অপর্ণা কথকের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছে তখন লক্ষ্য করলে দেখা যায় অপর্ণা আগাগোড়া বইয়ের উপরেই চোখ রাখে, যেন অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে নিজেকে দিয়েই নিজেকে আড়াল করে রাখতে চায়। 'শুধু মাঝে-মাঝে অতগুলো কালো মাথা ভেদ করে ওর চোখের দৃষ্টি আমারই মুখের উপর যেন এসে পড়তো।' এখানে এসে তাদের অনুভূতি যখন পূর্ণতা পায়, ঠিক তখনই গল্পকার আমাদের চোখে সামনে তুড়ি বাজিয়ে দেন 'তবে এটা খুব সম্ভব আমার কল্পনা।' আমরা গল্পের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি। মৃদু উঁচুনিচু পেরিয়ে গল্পের ক্লাইমেক্স তখন উর্ধ্বগামী হতে শুরু করেছে। দ্বিতীয়বারের মতো এই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হই, যখন গল্পকার এমএ ক্লাসের ছাত্র। ''বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের ছোটো ক্লাসে দুটো

বেঞ্চির ওপারে অপর্ণার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বছরটা কাটলো। আমার মনে হতো, অপর্ণা আমার দিকে ঘন-ঘনই তাকাচ্ছে।"[৫] তখন মনে হয় গল্প বুঝি পরিণতি পেতে যাচ্ছে। পরোক্ষণে বলেন, 'কিন্তু এটা নিশ্চয়ই আমার মনের ভুল।' তাতে মনে হয়, জ্যোৎস্নায় ভূত দেখার মতো, কথক নিজেকে শান্তনা দেয়। ক্লাইমেক্স তখন মধ্য গগনে অবস্থান করছে। শেষবারের একই অনুভূতির পুনরাবৃত্তি দেখি অপর্ণার বাড়িতে, কন্যা আশীর্বাদের অনুষ্ঠানে। "তারপর একটু চুপ করে থেকে ঈষৎ মাথা নেড়ে খুব নিচু গলায় বললে, 'কিছু বোঝেন না আপনি।' সঙ্গে-সঙ্গে শুনতে পেলুম অপর্ণার দীর্ঘশ্বাস, কিন্তু সেটাও বোধহয় আমার কল্পনা।"[৬] ক্লাইমেক্স বা চরম মুহূর্ত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝতে পারি, আমরা গল্পের শেষের যাত্রায় সামিল হচ্ছি। গল্প এখানে শেষ হতে পারতো। হলে গল্পের গাথুনির তেমন বিশেষ ক্ষতি হতো বলে মনে হয় না। বরং পাঠক একটা ট্রাজেডিক অতৃপ্তি নিয়ে পাঠ শেষ করতে পারতেন। তার ভাববার সুযোগ থাকতো। কিন্তু গল্পকার আরো এগিয়ে যান। তিনি কথকের মনের ভাব পুরোপুরি তুলে ধরেন। অপর্ণার বিয়ের কয়েকদিন পরেই কথক কলকাতায় চলে আসে, চাকরির চেষ্টায়। সে দশ বছর যাবৎ দর্শনের শিক্ষক। 'আইএ পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেদিন ভর্তি হলাম সেদিন মনে ভারি ফুর্তি হলো।' বুদ্ধদেব বসু তার 'আবছায়া' গল্প শুরু করেন এই ভাবে। কেন ফুর্তি হলো? শুধু কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, না আরো কিছু? উত্তর আসে দ্বিতীয় লাইন, 'কত বড়ো বাড়ি।' আমাদের মনে পড়ে— কি অর্থনৈতিক, কি রাজনৈতিক কারণে— ক্রমেই উন্মূল হয়ে আসা মানুষের মুখ। গল্প লেখার সময়ের দিকে তাকালে বুঝতে পারি, সময়টা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি। ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ

হয়েছে, আবার রদ হয়েছে। কিন্তু সমাজে তার চিড় রয়ে গেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে বদলে গেছে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট, ক্ষমতার সমীকরণ। তৈরি হচ্ছে আরো, ভয়ানক আরেক বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি ইতিহাসে খ্যাত 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' আর দেশ ভাগের দিকে। খেয়াল করলে দেখা যাবে, এই সময়ই ভারতবর্ষে মধ্যবিত্তের চরম বিকাশের সময়। রাজনীতি ও অর্থনীতিতে তাদের অংশগ্রহণ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এই ভূমিকার মানে হলো, একজন মধ্যবিত যুবক, যার সঙ্কট আছে, উত্তোরণের প্রতিশ্রুতি আছে। সেই সঙ্গে আছে তার কঠিন কঠোর বৃত্ত। সে এই বৃত্তে ঘোরপাক খাচ্ছে। অর্থাৎ বুদ্ধদেব বসু প্রথম বাক্যেই একজন মধ্যবিত্তের চোখে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছেন। আর মধ্যবিত্তই এই গল্পের কথক। গল্পের প্রথম অনুচ্ছেদ কথকের দেখা ও গল্পকারের দেখানোর মধ্য দিয়েই শেষ হচ্ছে। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুরম্য অট্টালিকা, বিস্তৃত আয়তন, ইংরেজি বলিয়ে শিক্ষকের ভাবগাম্ভীর্য ও কেতাদুস্থর ভাব কথককে অস্তিত্বের সম্মুখীন করেছে। বুদ্ধদেব বসু তার বর্ণনার মাধ্যমে একটা অপর-বাস্তব অবস্থার তৈরি করে বাস্তবতাকে ধরতে চেয়েছেন। কথক চিন্তায় ও ভূমিতে এতটাই উন্মূল যে, এসবে তার আত্মসম্মান বাড়ছে মনে করছে, নিজের সম্পর্কে 'অতিমাত্রায় সচেতন' করছে। তার মনে হচ্ছে, 'এতদিনে মানুষ হলুম, ভদ্রলোক হলুম।' ফলে কথক তার পোশাক, চেহারায় পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছে। শেষ লাইনে এসে গল্পকার বলছেন, 'তখন অবশ্য ভবিষ্যতের ভাবনা মনে ছিলো না, বালকত্বের খোলশ ছেড়ে খুব চটপট যুবাবয়সের মূর্তি ধারণ করাই ছিলো প্রধান লক্ষ্য।' অর্থাৎ অনুচ্ছেদটি পূর্ণতা পাচ্ছে। একটি দীর্ঘ অনুচ্ছেদ শেষ হয়। এর মধ্যদিয়ে গল্প কোন দিকে যাবে তার একটা ইশারাও

পেয়ে যাচ্ছি আমরা, এবং গল্পের শেষে পর্যন্ত আমরা সেই আশানুরূপ পরিণতি আশা করি।

গল্পের প্রথম অনুচ্ছেদে কথকের এতোসব আয়োজনের কারণ দেখতে পাই দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে গিয়ে। এর অবশ্য অন্য একটি কারণ ছিলো। কি সে কারণ? মনে এই প্রশ্ন নিয়ে আমরা গল্পে প্রবেশ করি। পরের বাক্যে লেখক উত্তর দেন 'বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি ছাত্রীও ছিলেন।' গল্পটা রোমান্টিক মুড পায়। অনুচ্ছেদের শেষে বলে দেন কারণটুকু। সেখানে দুইশত ছেলের মাঝে মাত্র ছয়জন ছাত্রী ছিল। তার মধ্যে অপর্ণা দত্ত নামে এক তরুণী ভর্তি হয়েছিল। সে এই গল্পের নায়িকা। তাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে সমস্ত ঘটনা। কিন্তু গল্প কোনো মাত্রায় নারী প্রধান হয়ে উঠতে দেননি লেখক।

তৃতীয় অনুচ্ছেদের শুরুতে অপর্ণা দত্তের সামান্য বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘিরে কথকের মনের বিভিন্ন মিথস্ক্রিয়াও দেখতে পাই। অপর্ণার উপস্থিতি যখন তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, বিশ্ববিদ্যালয় দেখার ফলে তৈরি হওয়া 'অতিমাত্রায়-সচেতনতা' বিলিয়মান হয়ে যায় তখন এই আহ্বান উপেক্ষা করেন। নিজেকে সচেতন দেখতে চান। ঘুম কাতর চোখে, আসলে ঘুমের মধ্যেই আছে সে, মাঝে মধ্যে শরীরের পশম ধরে টান দিয়ে নিজেকে সচেতন রাখার চেষ্টা করে। নিজের ভেতরের প্রবণতা, আগ্রহকে অবদমন করেন, মনের উপর তুড়ি বাজান। 'এটা খুব সম্ভব আমার কল্পনা।' কথকের আকাঙ্খা-সুপ্ত বাসনা-বিশ্বাসকে 'কল্পনা' বলে গল্পকার আমাদের গল্প সম্পর্কে সচেতন করে দেন। এটা শুধু কথক নয়, গল্পকার হিসেবে বুদ্ধদেব বসুরও তুড়িবাজি। যা এক হেঁচকা টানে আমাদের গল্পের

ভেতরে নিয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই গল্পের অশোকদের উপস্থিতিও কথককে অস্তিত্বের সম্মুখীন করে দেয়। অশোকের পোশাক, খরচের হাত, খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পারদর্শিতা, সাহস সবই কথকের অস্তিত্বের জন্য একপ্রকার হুমকি। 'সত্যি বলতে, ওর প্রতিদ্বন্দ্বী হবার মতো ছেলে আর ছিলো না।' নিজের বিচ্ছিন্নতা থেকে তৈরি হওয়া জিঘাংসা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। দূর থেকে কারো উন্মেষ দেখে অবদমিত মনবাসনা জেগে ওঠে। এই জিঘাংসা তাকে স্বস্থি দেয় না। তার চোখ হিরো তৈরি করে অন্যকে। যে শেষপর্যন্ত অপ্রতিদ্বন্দী হয়ে ওঠে সবার। গল্পে অশোকের এই উপস্থিতি অনেক সময় মনে হয় একটি এন্টি-হিরো। অর্থাৎ অপর্ণার জন্য কথকের মনে অস্ফুট রসায়ন ও মিলনের মধ্যে বাধা হয়ে দাড়াচ্ছে। কিন্তু গল্পের বয়ানে অশোককে আর এন্টি-হিরো হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। টোটাল কন্টেক্স দাড়ায় অশোক না হলেও কথক হয়তো অপর্ণাকে গ্রহণ করতে সচেষ্ট হতো না। মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই অশোকের উপস্থিতির মাধ্যমে অপরবাস্তবতা তৈরি করে গল্পকার কথকের মনের বাস্তবতাকে ধরতে চেয়েছেন।

গল্পের চতুর্থ অনুচ্ছেদের শেষে 'কতদিন আমাকে নিয়ে ক্লাশ পালিয়েছে, শীতের সুন্দর দুপুর বেলায় ঘাসের উপর বসে আমাকে শুনিয়েছে অফুরন্ত অপর্ণা-চরিত। এ ধরনের গল্প সাধারণত ক্লান্তিকরই হয়, কিন্তু আমি স্বীকার করবো যে, আর কিছু না হোক, বার-বার ওই অপর্ণা নামটি শুনতেই আমার ভালো লাগতো।' এখানে এসে গল্পের কথক, অপর্ণার সম্পর্কে খোলাখুলি হয়ে পড়ে, আগের মতো ঢাক গুড়-গুড়, ঢাক গুড়-গুড় মনোভাব আর রাখছে না। পরবর্তীতে আমরা খেয়াল করি এই ভাব বজায় থাকছে। অপর্ণার প্রতি তার দুর্দমনীয়টা স্বীকার

করে নিয়েই বিষয় উপস্থাপন করছেন। গল্পে অশোক কথককে অপর্ণার কথা বলে। অপর্ণার সাঙ্গ-সাহচার্য পাওয়ার জন্য প্রয়োজনে সে কথককে সঙ্গে নিতে বাধ্য হচ্ছে। কন্যা আশীর্বাদের দিন অপর্ণাই জিজ্ঞেস করে 'এতদিন আসেননি কেন?' নারীকে বন্দি রাখার দিনেও অপর্ণা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে তার অন্তর্হিত শক্তিরই পরিচয়ই দেয়। অপর্ণার প্রশ্নের জবাবে সে কেবল উত্তরই দিতে পারে। কোনো প্রকার আলাপ পাততে পারে না। তার সেই শক্তি সে সময় নেই। কথক বলে, 'অবিশ্বাস করিনি, তবে—'। তখন ধরা পরে তার মানসিক অবস্থা। অবিশ্বাস করেনি, তবে—তবে কি? বিশ্বাসও করতে পারেনি। বিশ্বাসের দায়-ভার তার মধ্যবিত্তিয় দোলাচলে থেকে সে বহনও করতে পারে না। তাই সে বিশ্বাস করেনি।

গল্পে বর্ণনায় তেমন অতিশয্য নেই। আছে গতি আর গীতিময়তা। সেদিকে দিয়ে গল্পে সংলাপও কম। শেষে অপর্ণা ও কথকের মধ্যকার কথা গল্পের দীর্ঘ সংলাপ। কিন্তু গল্পজুড়ে মন ও পরিস্থিতি, ব্যক্তি ও বাস্তবতার যে দ্বন্দ্ব তা গল্পকে দাঁড় করে দিয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে, গল্পটাকে আমরা ট্রাজেডিক, না নিপাট প্রেমের গল্প বলবো। বুদ্ধদেব বসুর ছোট গল্পের দিকে খেয়াল করলে দেখা যায়, তাঁর প্রথম দিকের প্রেমের গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে প্রসন্নতা ও সার্থকতা, দ্বিতীয় পর্বে এসে বিচ্ছেদ ও ব্যর্থতার দিকগুলো। এটি তার মধ্য সময়ের গল্প। গল্পটি নিঃসন্দেহে প্রেমের গল্প। এতে প্রেমের প্রগালভের চেয়ে এখানে প্রাধান্য পেয়েছে অ-প্রেমের যন্ত্রণা। গল্পে পাত্র-পাত্রীদের মানসিক সম্পর্কের মধ্যে বইয়ে দিয়েছেন সাহিত্যের ঘাত 'ঠাণ্ডা আগুন'। এ আগুন আপাত দৃষ্টে দেখা যায় না, কিন্তু পোড়ায়। আবার প্রচলিত অর্থে যে ভাবে ট্রাজেডিকে বোঝানো হয়, তা না হলেও তিনি গল্পের

ট্রাজেডিকে চাপাচ্ছেন বাস্তবতা তৈরি বা বর্ণনার মাধ্যম হিসেবে। ফলে ট্রাজেডি ও রোমান্সের মিলনে একটা চমৎকার গল্প পাই। তাছাড়া সাহিত্যে 'ট্রাজেডিক এরর' বলতে যা বোঝায় তা এখানে আছে। শেক্সপিয়রের নাটকে ওথেলোর ট্রাজেডিক এরর যেমন ছিল প্রবল ঈর্ষা, তেমনি এই গল্পের কথকের মধ্যে আছে ঔচিত্ত্য, অবদমন আর ভুলানুবাদের প্রবণতা।

বুদ্ধদেবের কাব্যের সঙ্গে পরিচিত পাঠকেরা অজ্ঞাত থাকে না ''সুন্দরের ধ্যান মোর এরা সব ক্ষণে ক্ষণে ভেঙে দিয়ে যায়। কাঁদায় আমারে সদা অপমানে, ব্যথায় লজ্জায়।''[৭] প্রথম কাব্যগ্রন্থে বুদ্ধদেব বলেন, ''বাসনায় বক্ষো মাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন / দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর / রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষবর্ষ উপবাসী শৃঙ্গার বাসনা রমণী রমণরণে পরাজয় ভিক্ষা মাগে নিতি/ তাদের মেটাতে হয় বঞ্চনার দুর্দম বিক্ষোভ।''[৮] দেহের এই আকাঙখা থেকেই প্রেমের সূত্রপাত, কিন্তু এখানেই তার শেষ নয়, দেহকে আশ্রয় করে প্রেম যখন দেহ-উত্তীর্ণ হতে পারে, বন্ধনের ক্ষুদ্র সীমাকে উর্ধায়িত করতে পারে তখনই আসে পরিপূর্ণতা। বুদ্ধদেব ছাড়া আর কোন কবি লিখতে পারতেন এই পঙক্তিগুলি, 'এ জীর্ণ পাতার স্পর্শ নারী মাংসের চেয়ে সুখকার মলাটে ধুলির গল্প — সুখমদ্য তার তুল্য নয়।'[৯] — এতেই বোঝা যায় প্রেম শব্দটি রোমান্টিক কবির প্রাণে কী রকম অনুভূতি আনতে পারে, এ কবিই পাঠককে জানান 'মনে হয়— আর কারো নয়— ভালোবাসি ভালোবাসারেই।' এ উক্তিকে সামনে রেখে প্রেমের বিচিত্র গতির শিল্পিত রূপ পরিদৃশ্যমান। কিশোর-কিশোরী-লীলার স্বপ্ন বাসনা থেকে শুরু করে সুখবাদী মানুষের রতি ও বিরংসার নগ্নচিত্র যেমন তিনি অঙ্কন করেছেন তেমনি বন্দনা করেছেন ত্যাগে ও আত্মনিবেদনে মধুর ও সুন্দর প্রেমের মহিমাকে।

কিশোর প্রেমের যে প্রেমানুরাগ ও উদার তন্ময়তার চিত্র 'আমরা তিনজন' গল্পে চিত্রিত করেছেন বুদ্ধদেব বসু— এতেই নিহিত রোমান্টিক কবির তন্ময়তার স্বরূপ, 'রসতীর্থের পথিক' বলেই সেটা সম্ভব। গল্পটি বিশ্লেষণ করলে অনুভূত সত্যটির মুখোমুখি হওয়া যায়। প্রসঙ্গত মনে পড়তে বাধ্য 'দাম্পত্য আলাপ' গল্পের এই উক্তি— ''কোনো ব্যক্তির সঙ্গে প্রেমের পড়ার অবস্থা এটা নয়, এটাকে বলতে পারো প্রেমের সঙ্গেই প্রেমে পড়া।''[১০] জন্ম রোমান্টিকের পক্ষেই এরকম একটি পংক্তি লেখা সম্ভব।

বুদ্ধদেব বসু প্রেম ও মনস্তত্ত্বের নিপুণ বিশ্লেষক, সে কিশোর প্রেমই হোক, যৌবনের উন্মাদনায় একান্তপর ভালোবাসাই হোক কিংবা ড্রয়িংরুম কেন্দ্রিক শিক্ষা ও রুচির সম্মিলনেই হোক— সর্বত্রই তার পরিচয় মেলে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'রজনী হলো উতলা', 'আমরা তিনজন' 'রেখাচিত্র', 'অতনু মিত্র, সাবিত্রী বোস আর বুলু' 'দু একটা কণ্ঠস্বর', 'অভিনয় নয়' 'একটি লাল গোলাপ' প্রভৃতি গল্পগুলোতে প্রেমের বিচিত্র স্বপ্ন ও সাধের পরিচয় তুলে ধরেছেন। 'আমরা তিনজন' গল্পে কিশোর বয়সের ভীরুকম্প প্রেমের বিন্যাস ফুটে উঠেছে। গল্পটিতে পাই বিকাশ, হিতাংশু, অসিত তিনজনই অন্তরাকে ভালোভাবে। এই তিনজনের প্রেমের কোরক মেলে দিয়েছিল সেই অন্তরাই, একসময় দূর থেকেই, সে নীল রঙের বা বেগুনি যে রঙের শাড়ি পড়ে থাকুক না কেন তাতেই তাকে বড়ো ভালো মানায় এরকম চিন্তার বিভোর তিনজন, একদিন বিকাশের মুখ দিয়েই বেরোল ''ওর মুখ অনেকটা মোনালিসার মতো।''[১১] এই নিয়ে প্রচুর কথা হলো তিন বন্ধুর, কিন্তু নামটা গৃহীত হয়ে গেলো যখন অন্তরার সান্নিধ্যের অমল বাতাস তারা পেতে শুরু করলো, অনেক দ্বিধার পাহাড় সরিয়ে বিকাশ বলেই ফেললো এ-নামেই ওকে ওরা ডাকতে অভ্যস্ত। বিস্ময়

বিমূঢ় জিজ্ঞাসায় রঙের ছোয়া লাগলো অন্তরারও। তারপর তাঁর অন্য এক প্রতিষ্ঠিত পুরুষের সঙ্গে বিবাহ, এতেও কারও মনে কোনো অসূয়া বাসা বাঁধল না, মোনালিসার জন্য নির্বাচিত পুরুষটিরও বশংবদ হয়ে গেলো যেমন করে একদিন তার বশংবদ ছিল, এমনকী সন্তান সম্ভাবনাময় নারীটির জন্যে ব্যাকুলিত চিত্ত, যা পরিজনের হওয়া সম্ভব এবং সন্তান জন্ম দিতে তার মৃত্যুর মধ্যেও বেদনার রঙে চিত্রিত হয়ে রইলো তাদের অপরাজেয় প্রেম। কোনো নিবিড় প্রেমের কারিগরের পক্ষেই এমন গল্প উপহার দেওয়া সম্ভব।

আসলে এই গল্পটি কিশোর মনের বয়ঃসন্ধির গল্প। প্রেম যখন আত্মরতিতেও পৌছয়নি, স্বপ্নরতিতেই মশগুল হয়ে আছে, সংগমতৃষ্ণতার চেয়ে অসঙ্গলিপ্সাই যখন বড়, তখনকার চেতনালোকে নারীর প্রথম আবির্ভাবের কাহিনী। বিকাশ, অসিত আর সিতাংশু— ঢাকার পুরানা পল্টনের 'থ্রি মাস্কেটিয়ার্স', সবেমাত্র স্কুলের গণ্ডী উত্তীর্ণ হয়েছে। মনের সেই বয়সে পদার্পণ করেছে যখন বন্ধ গাড়ির দরজার ফাঁকে একটুখানি শাড়ির পাড়ই স্বর্গের আভাস বহন করে আনে। গল্পটি কিছুই নয়-পাড়ায় নবাগত প্রতিবেশীর কন্যার সঙ্গে পরিচয়, তার সামান্য সান্নিধ্য লাভ, টাইফয়েডে দীর্ঘদিন ধরে তার সেবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হওয়া এবং অবশেষে তার বিবাহ ও প্রথম সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে তার মৃত্যু— এই হল গল্পটির বিষয়বস্তু। অতি সাধারণ ও স্বাভাবকি কাহিনী কিন্তু নবকৈশোরের প্রথম প্রেম চেতনা নিয়ে এমন আশ্চর্য সুন্দর গল্প বাংলা সাহিত্যে প্রায় বিরল। টাইফয়েডে মূর্ছিত প্রায় মেয়েটির অস্ফুট অস্পষ্ট প্রলাপবচন ও কিশোর এয়ের মর্মের মনিকোঠায় অপূর্ব সম্পদ হয়ে দেখা দিয়েছে। সেবার ফাঁকে ফাঁকে একটু অবসর পেলেই তারা যেন তিনজন কৃপণ পৃথিবীকে লুকিয়ে তাদের মণিমুক্তো ছুঁয়ে ছুঁয়ে

দেখছে বন্ধ ঘরে। মণিমুক্তোই বটে! কৈশোরের অম্লান স্বপ্ন পরবর্তী জীবনে মহার্ঘতম সম্পদ হয়ে দেখা দেয়। এই স্বপ্ন, এই সৌরভের পূর্ণ মর্যাদা বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যে বর্তমান।

লেখকের প্রথম জীবনের লেখা গল্প 'রেখাচিত্র'তেও এই স্বপ্নের প্রতিই লেখকের পক্ষপাতিত্ব পরিদৃশ্যমান। বাস্তবের কঠোর আঘাতে তরুণ যৌবনের স্বপ্নভঙ্গ হয়, প্রত্যহের দিন যাত্রায় সংসারের কর্কশতা হৃদয়ের সৌন্দর্য ও মাধুর্যকে নিঃশেষ করে দেয়। গল্পটিতে পাশের বাড়ির ননদ-ভাতৃবধূর কুৎসিত কোন্দলের মধ্যে যে কদর্য বাস্তবতার চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে তার বৈসাদৃশ্যে স্বপ্নকামনার সুকুমার আলেখ্যটি আরো রমণীয় আরো হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। প্রেম জীবনে সার্থক হয়ে উঠল না বলে যে বিচ্ছেদকে এতদিন অভিশাপ বলে মনে হয়েছিল, বাস্তব জীবনের ছবি দেখে তাকেই আশীর্বাদ বলে বিশ্বাস হয়েছে। গল্পের উপসংহারে বক্তা বলছে— ''তোমার যৌবনের একটি উজ্জ্বল শুভক্ষণ আমাকে দিয়াছিলে তাহাই আমার যথেষ্ট, তাহাই আমার আজীবনের স্মৃতিমন্থন উপহার।''[১২]

বুদ্ধদেবের প্রেমের গল্পে অনেক ক্ষেত্রেই এই স্মৃতি-সমুদ্রমন্থন করা যৌবনের একটি উজ্জ্বল শুভক্ষণ হলাহল-জর্জরিত জীবনে অমৃতের সন্ধান এনে দিয়েছে। 'দু-একটা স্বর' এবং 'দাম্পত্য আলাপ'-এও এই একই সুরের আলাপ, 'দু একটা স্বর' সাহিত্যিক শিবপ্রসাদ দত্তের বঞ্চিত হৃদয়ের নিঃস্বঙ্গতায় করুণ হয়ে উঠেছে। শিবপ্রসাদের জীবনে পঞ্চাশোত্তর যুগ বিপুল খ্যাতি ও সংবর্ধনা বহন করে এনেছে। সম্পাদক, প্রকাশক, নাটক এবং সিনেমাওয়ালাদের ভিড় তার ঘরে লেগেই আছে। সভাসমিতিতে অভিনন্দন কুড়িয়ে কুড়িয়ে সে ক্লান্ত। আজ সে সাহিত্য বানায়, সাহিত্যের ব্যবসা করে। কিন্তু তার জীবনে একদিন সত্যিকার কাব্য

ছিল, কাব্যের প্রেরণাও ছিল। যেদিন সে তার প্রেরণাময়ীর কাছ থেকে পেল প্রত্যাখ্যান সেদিন থেকে তার কাব্যেরও অবসান ঘটল! আজ তার বাড়ি-গাড়ি সবই আছে, কিছুরই অভাব নেই। অভিনন্দনের মালা-চন্দনে জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সবার উপরে আছে সেবাময়ী স্ত্রীর অভার অক্লান্ত যত্ন। তবুও মনের কোণ শূন্যই রয়ে গেছে। আজ তার জীবনে সব আছে নেই তো শুধু সেই প্রেরণাময়ী, যে ছিল তার জীবনের কাব্যের সাহিত্যের মূল প্রেরণা। খ্যাতি ও বিত্তের প্রাচুর্যে হৃদয়ের শূণ্যতা কখনোই পূর্ণ করা যায় না, তাই তার হৃদয়ের শূণ্যস্থান শূণ্যই রয়ে গেছে।

বুদ্ধদেব বসুর 'আমরা তিনজন' নামক গল্পের ঠিক বিপরীত মেরুতেই দাড়িয়ে আছে 'অতনু মিত্র, সাবিত্রী বোস আর বুলু' গল্পটি। যে রোমান্টিক ভাবনা ইংরেজ জীবন থেকে আপতিত হয়েছিল তৎকালীন বাঙালি জীবনে, ইংরেজি-সাহিত্য পঠন-পাঠনে দুরস্ত, উচ্চবিত্তের ড্রয়িংরুম কেন্দ্রিক পরিবেশ সৃজিত হয়েছিল, যেখানে বঙ মৃত্তিকার স্পর্শ বিবর্জিত জীবন বিন্যাস প্রত্যক্ষ হয়েছিল, সেই পরিপ্রেক্ষিতে সাবিত্রী বোসের জীবন প্রবাহিত হয়ে চলেছিল। ''সাবিত্রীর বাপ ব্যারিস্টার, লাভলক প্লেসে ওদের বাড়ি। ওর উপাসকের দল বলে সে ও বাংলার আগে ইংরেজি শেখে, এবং ইংরেজির চেয়ে ভালো জানে ফ্রেঞ্চ।''[১৩] সাবিত্রীর কথাবার্তা ইংরেজি বাংলায় মিশেল হলেও ফরাসি পুরোপুরি ওর দখলে, চালচলনে ওর সাথে কারো জুরি নেই। ''ওর মতো ঝকঝকে ফিনফিনে হালকা মজাঘষা শরীর আর কোনো মেয়ের আছে কিনা সন্দেহ। ওর মতো ভুরু নাচাতে, ঠোট বাঁকাতে, কাঁধ ঝাঁকাতে আর কোনো মেয়ে কি জানে?''[১৪] ওর চলাফেরা বিলিতি ছাদে বাঁধা, এতে ওর শরীরের নারীত্ব আরও পরিস্ফুট হয়ে পথিক পুরুষের চিত্ত বিভ্রম ঘটায়। পুরুষ-সৌন্দর্যের

প্রতিভূ অতনুকে সাবিত্রী বোস কুয়াশার মতো ঘিরে আছে। এখানে সেই বুদ্ধদেবকে পাওয়া যায়, যার অধিকাংশ নায়ক ইংরেজি সাহিত্যের সাগর মন্থন করে উঠে এসেছে। লেখক গোড়াতেই বলে রেখেছেন 'এ গল্পের নায়ক অতনু নয়, অতনুর চেহারা'। কী যে ছিল বিধাতার মনে, একটি কালো মেয়ের প্রভাব সাবিত্রী রূপিণী প্রহেলিকা ভেদ করে আলোর মতো অতনুকে বাঁধল। তারই ঘোরে অতনু, বন্ধুর বাড়ি এসে প্রভাত মুখুয্যের গল্পের বই চাইল, ইংরেজির চেয়ে ফ্রেঞ্চ বেশি জানা সাবিত্রী বোসকে পেরিয়ে বুলুকে দেখার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে সে, বুলুকে দেখে প্রথম মনে হয়না ওর মধ্যে দেখার কিছু আছে, রাতে খেতে বসার সময় মার কাছে বুলুর গল্প শোনে, ভারি লক্ষ্মী মেয়ে, যেমন কাজের, তেমনি মিষ্টি স্বভাবের। নবযৌবনা মেয়েদের এই গতানুগতিক বর্ণনা শুনলে স্বভাবতই অতনুর বিরক্ত হবার কথা, এরকম মেয়ে তার বইয়ের টেবিল গোছালে বিরক্তির মাত্রা বাড়ার কথা । কিন্তু এরকম হলো না । এলোমেলো করে বইয়ের টেবিল পরিপাটি করে গোছানো, এমনি একদিন মানিব্যাগ নিয়ে বেরোনোর জন্য বাড়ি ফিরে আসতে হলো, এসে সে দেখলো মাটিতে বসে মা চুল বেঁধে দিচ্ছে একটি মেয়েকে। কোলের ওপর এলিয়ে স্তুপ হয়ে পড়ে আছে আঁচল, গায়ে পাতলা সাদা ব্লাউজ, মাথাটি একটু পেছনে বলে গলা আর থুৎনিতে এত রূপ থাকে তা আগে জানা ছিল না। এখান থেকেই পালাবদল ঘটল। কাহিনির, কালো সেই মেয়েটির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করল অতনু।

এই গল্পটি কিশোর-কিশোরীর প্রণয়লীলার রম্যচিত্র। অতনু মিত্র রোমান্সের রাজহংস। ওর ধারণা হৃদয় জিনিষটা সভ্য মানুষের কুসংস্কার। বলতে গেলে মেয়েদের হাওয়ায় হাওয়ায় সে বড় হয়েছে। নারী সান্নিধ্যের মাখন খাওয়াই অভ্যাস ওর। গল্পটির সুনিপুণ শিল্পরূপ চূড়ান্ত শিখরে আরোহন করেছে অন্তিম

লগ্নে। যেদিন বুলু চলে যাচ্ছে সেদিন অতনু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল। স্বপ্নের মধ্যে বুলু যেন তার কাছে এল। হঠাৎ একটি ফুলের গন্ধ অতনুর স্বপ্ন চেতনাকে আবিষ্ট করে দিল! ''ফুলের? না মেয়েলি প্রসাধনের? অথবা ও যেন দেহেরই গন্ধ-দেহেরও নয়, মনের-স্ত্রীসত্তার চিরন্তন সৌরভ যেন।''[১৫] স্বপ্নভঙ্গে মনের খুশিতে অতনু গেল সাবিত্রী বোসের কাছে। আর আশ্চর্য, যে গন্ধকে সে বুলুর দেহ সুরভি মনে করে স্বপ্নে পুলকিত হয়ে উঠেছিল, সাবিত্রীর আলিঙ্গনে ধরা দিয়ে অতনু জানতে পারল সেটা সাবিত্রীরই নতুন প্রসাধনের সৌরভ। অতনু মিত্রের জগতে, এমনকি তার স্বপ্নকামনায়ও বুলু নয়, সাবিত্রী বোসই যে সত্য এই প্রতিপাদ্যকে একটি সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তুলে লেখক এই গল্পে কাব্যের সৌরভ সঞ্চার করেছেন।

বুদ্ধদেবের গল্পে প্রেমভাবনা ও শিল্পিত সুষমা অনেক ক্ষেত্রেই এক হয়ে উঠেছে। আবার প্রেমের ঐশ্বর্য স্বীকার করে নিয়েও বুদ্ধদেব শরীরকে নির্বিচারে স্বীকার করে নিয়েছেন, শুধু শরীরে নিবদ্ধ না থেকে, তার আরও উত্তরণ সম্ভব সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এত বেশি কাব্যধর্মী, এত বেশি রোমান্টিক ভাবনার আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন, এত বেশি শিল্প সৌন্দর্যে প্রণত থেকেছেন, কাব্য থেকে জীবনের সংকটাকুল প্রান্তরে তা কতখানি গ্রহণযোগ্য ভাববার অবকাশ টুকুও পাননি। এমন ভাবনার প্রতিফলন ঘঠেছে তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গল্প 'এমিলিয়ার প্রেম'— এ। যে এমিলিয়া ও ভাস্করের ভালবাসা একটা অদ্ভুত দ্বীপের সৌরভে ভরপুর, অনেক দেখা, অনেক জানার মধ্যে এমিলিয়ার চোখে জানার ঝিলিমিলি, ভাস্করের নিবিড়তম চুম্বনেও সেই আলো একেবারে নিভে যেত না। তবু— এমিলিয়া চাইতো সে আলো নিভে যাক, আরো অন্ধ হোক চুম্বন, অন্ধ হয়ে যাক চোখ। ''আ— এত দেখবার পর অন্ধ হয়ে যাওয়া তার মতো ভালো আর

কী?"[১৬] — এই যে মধুরতম ইপ্সা, এই যে ভাবনার জগৎ তা ভাস্করের মধ্যেও সমানভাবে বিদ্যমান ছিল, ''সুখী, সুখী, সুখে আমি পাগল হয়ে যাবো, ভাস্কর।"[১৭] — এমিলিয়ার এই পরিতৃপ্তির জগৎ দেখে তার মনে হত, এই পরিতৃপ্তির মধ্য দিয়েই প্রেমের সমাধি হোক,—''আজকের ভালোবাসা, ভালো লাগা যদি কালের মধ্যে না পাওয়া যায়, তবে কেন বেচে থাকা, কার জন্য বেঁচে থাকা, প্রেমের শীর্ষদেশ এখানে এবার তো নেমে আসার পালা, এমিলিয়া ভালোবাসার তৃষ্ণায় আমি যে মরে যাচ্ছি। .... যে মুহুর্তে তুমি আমাকে আর ভালোবাসবে না, সে মুহূর্তে আমি মরে যাবো।"[১৮] এমন মুহূর্তকে চিরন্তন করে দিতে তাই সাধ জাগে ভাস্করের। এরই মধ্যে প্রদোষ ঘোষ-এর আবির্ভাব ঘটলো, যার মুখে স্বাস্থ্যের রক্তিমা, সরল প্রফুল্লতায় ভরা, একেবারে জাত অপটিমিস্ট, এ-ও এমিলিয়ার কাছে বলীপ্রদত্ত, অতএব এমিলিয়া ভাস্করের মিলন মুহূর্ত অনন্ত হয়ে উঠুক, এমন ভাবনা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে। উন্মাদনা, অসহ্য উন্মাদনায় কাটলো কয়েকটা দিন। তারাও যেন পরস্পরকে এমন হিংস্রভাবে আর ভালোবাসেনি। তবু প্রদোষের সঙ্গে এমিলিয়ার পূর্ব পরিচয় এখন তার অজানা নয়, ''প্রেম থেকে হিংস্রতা, তা থেকে প্রতারিত হয়েছে বলে ধারণা, সব মিলিয়ে অক্ষয় করে যেতে চায় তার প্রেম।"

আসলে এই গল্পে নাগরিক প্রণয়লীলার রূপায়ণ ঘটেছে। হয়ত গল্পটির ভাব প্রেরণায় ব্রাউনিঙের 'পরফিরিয়ার প্রেমিক' কবিতার প্রভাব বিদ্যমান, কিন্তু 'এমিলিয়ার প্রেম' প্রেম সম্ভোগের কাব্যমাত্রই নয়, গল্পটি অভিজাত নগরজীবনের একটি বাস্তব ও জীবন্ত চিত্র। এ গল্পের নায়ক ভাস্কর চিত্রশিল্পী, সে বারো বছর ইউরোপে কাটিয়ে এসেছে; নায়িকা এমিলিয়া কোনো এক দেশি রাজ্যের মন্ত্রীকন্যা, তার জন্ম ইটালিতে। উভয়ের সাক্ষাৎ বিলাসিনী মহানগরীর বিলিতি হোটেলের

নাচের আসরে। প্রথম সাক্ষাতেই ভাস্কর আর এমিলিয়া হিংস্র আবেগে পরস্পরকে দখল করে বসল। তারপর চলল দিনের পর দিন দেহ-সম্ভোগলীলা। শান্ত সোনালি সুখ আঙুরের মতো নিটোল হয়ে ফলে উঠতে লাগলো দেহের বৃন্তে। কিন্তু এমিলিয়ার জীবনে ভাস্কর তো প্রথম এবং একমাত্র পুরুষ নয়! পূর্ব প্রণয়ীর সাক্ষাতে ভাস্করের সর্বগ্রাসী প্রেমে জাগল ঈর্ষা এবং সন্দেহ। হতভাগিনী এমিলিয়া যখন তার কাছ চরম আত্মনিবেদনের সুখে হাজির হল তখন অতি গভীর প্রেমে ভাস্করের জোরানো আঙুল গভীর হয়ে বসে গেল এমিলিয়ার গলায়, সে তাকে হত্যা করল। এ গল্পের ফলশ্রুতি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু বুদ্ধদেবের অন্যান্য উৎকৃষ্ট রচনার মত এ গল্পও বিশুদ্ধ শিল্প সৃষ্টি। 'এমিলিয়ার প্রেম' শুধু সার্থক ছোট গল্প হিসেবেই নয়, সুখবাদী অর্থাৎ সমাজের উপরের স্থরের লোকের প্রণয়লীলা সম্পর্কে বুদ্ধদেবের শিল্পদৃষ্টির উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসেবেও অনবদ্য।

'হতাশা' গল্পটি বুদ্ধদেবের সাহিত্যে দলছুট। এই গল্পে প্রেমের পরিচিত বিন্যাসটি উহ্য রেখে বুদ্ধদেব বসু দাম্পত্য প্রেমের একটি অনুচ্চারিত নকশা বুনেছেন। এই গল্পের নায়ক অনুপম নিষ্কর্মা, স্বপ্ন বিলাসী, পরিশ্রমবিমুখ মিথ্যাচারী, কপট — এমন চরিত্রের আত্ম ছলনা,পরিজনের প্রতি ছলনার ইতিবৃত্ত বুদ্ধদেব প্রকাশ করেছেন গল্পে। স্ত্রীর বিশ্বাসকে যেভাবে সে পদদলিত করে সকলের সামান্য আশাকে ধূলিসাৎ করে দিতে চায়, তাতে তার মনুষ্য পদবাচ্য হবার যোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন উঠে আসে। মানুষ অনেক সময় নিজের স্বরূপ নিজেই জানেনা বা জানতে চায়না, নিজের অন্তর্গত ইপ্সা অভীপ্সা অজ্ঞাতেই থেকে যায়, অনুপম নিজেকে নিজে কতখানি চেনে এ বিষয়ে সন্দেহ জাগে। দিনের পর দিন সে তার স্ত্রীকে প্রতারণা করে চলেছে, তার অন্ধবিশ্বাসকে পদদলিত করেছে। আসলে অনুপমের মূল ইচ্ছেটা কি এটা বোঝা

দায়, তার বাবা যখন পঞ্চাশ টাকার মাইনের একটি চাকরির ব্যবস্থা করে এনেছেন, অনুপম বলে — 'পঞ্চাশ টাকায় আমার কী হবে' অথচ স্ত্রীর কাছে একটা টাকা ধার চাইতে তার বাঁধছে না, তাদের বাড়িটা ছোট বলে এটা ভাড়া দিয়ে বড়ো বাড়িতে যাবার স্বপ্নও দেখছে। এমন মানুষের অভিলাষ বোঝা মুশকিল, অন্তত সুরমার মতো সরল বিশ্বাসী নারীর পক্ষে তো নয়-ই। সুরমা স্বামীর প্রতি প্রেমের স্বাভাবিক আর প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্কে আবদ্ধ। একটি শান্ত, নিস্তরঙ্গ জলাশয়ের লাবণ্য নিয়ে সে স্বামীর পরিচর্যা করে চলে। এই গল্পে দাম্পত্য প্রেমের সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে।

বুদ্ধদেব বসুর 'একখানা সাবান ও একটি মেয়ে', গল্পটিতেও অস্ফুট প্রেমের অপমৃত্যু প্রধান উপজীব্য। ক্ষুধা দারিদ্র অবমাননা নিঃসঙ্গতার গ্লানি উপেক্ষা করে গোপনে সঞ্চিত শেষ পুঁজি দিয়ে যে মনোমুগ্ধকর ও মহার্ঘ দ্রব্যটি কেনে সুনীল, সেটির ভূমিকা তার কাছে অকিঞ্চৎকর বোধ হয় ভালোবাসার নারীর কৃত্রিমতা সর্বস্ব ব্যক্তিত্বের শূন্যগর্ভ জীবনের পরিচয় পেয়ে। বাস্তবের অসম্পূর্ণতা থেকে সাময়িক মুক্তির জন্য সুনীল যেভাবে প্রায় অবাস্তব কাণ্ড করে দামি সাবান কিনে সেভাবেই হৃদয়রঞ্জনও মেসবাড়ির স্যাঁতসেঁতে দেওয়ালে ফুটে ওঠা বিচিত্র ছবির মাধ্যমে ভুলে থাকতে চান প্রাত্যহিকতার ক্লান্তি। সুনীল তার ভালোবাসার মানুষের তুলনা সহ্য করতে না পেরে যেভাবে সাবানটা ফেলে দেয়, সেভাবে হৃদয়রঞ্জনও তাঁর স্বপ্নের দৃশ্যপট চুনকাম করানোর জন্য মেস— মালিককে প্রাণে মারতে ছোটেন।

বুদ্ধদেবের 'সার্থকতা' গল্পে অভাবগ্রস্ত সিতাংশুকে বারবণিতা অমলাকে ভালোবেসে পাপপঙ্কিল জীবন থেকে তাকে সরিয়ে নিয়ে দূরে ঘর বাঁধবার আশায়

মালিক নবীন বাবুর টাকা চুরি করে, তার পেছনে একধরণের হঠকারিতা ক্রিয়াশীল; সেখানে সিতাংশু নামক চরিত্রটি অমলার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও রূঢ় বাস্তবতার নিষ্পেষণ থেকে পরিত্রাণ করতে চায়; যদিও মূল কাহিনিটি অনাবশ্যক দীর্ঘায়িত ও অতি নাটকীয়তা আচ্ছন্ন হবার ফলে সিতাংশুর প্রেম ও ত্যাগ স্বীকারের সার্থকতা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় না।

হৃদয়ের জাগরণ এর প্রথম গল্প 'আদর্শ' এই কারণে উল্লেখযোগ্য যে চলচ্চিত্র নায়িকা ও তার ব্যর্থ লেখক স্বামী অনিমেষের প্রেমহীন, জীবনের খণ্ডচিত্র এর কাহিনিভাগ, সেখানে এসে পড়ে তাদের একদা প্রেমপর্ব দাম্পত্যপর্বের স্মৃতির ঝলক। সম্পর্কের সেতুবন্ধনে ব্যর্থ, হৃদয় উত্তাপের অন্বেষণে অপারগ দুই নারী পুরুষের ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব গল্পটির সিংহভাগ জুড়ে থাকলেও গল্পের শেষে অনিমেষের অর্ধ সমাপ্ত উপন্যাসের একটি বিচ্ছিন্ন অংশের সন্ধান পাই, যা শুধু গোটা গল্পটিরই আত্মা নয়, গল্পকার বুদ্ধদেব হয়তো সামগ্রিকভাবে শিল্পী বুদ্ধদেবেরই জীবনাদর্শ বলা যেতে পারে। বুদ্ধদেবের গল্পের আবেদনের সঙ্গে অনিমেষের অসমাপ্ত উপন্যাসের খণ্ডিত অনুচ্ছেদগুলির সুরধ্বনি অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ। অনিমেষ যখন খাতা বন্ধ করে নিজের লেখাটি সম্পর্কে ভাবে, সেই ভাবনার মধ্যেও আমরা খুঁজে পাই বুদ্ধদেবের সাহিত্য ভাবনা ও শিল্পাদর্শের ঠিকানা। তাঁর 'নাম' ও 'সাদা পাতা' নামক গল্প দুটিতে প্রৌঢ় নায়কের বিমূর্ত নারীর প্রতি দেহহীন প্রেম বা প্রেমের অনুষঙ আখ্যানভাগ আচ্ছন্ন করে রাখে। অবশ্য তুলনামূলকভাবে 'তুমি কেমন আছো'-র আখ্যানভাগে বহিরঙ্গের উপাদান কিছু বেশি। কেন্দ্রীয় চরিত্র গ্লাসগো ও বার্লিনে পাশ করা এবং ডেট্রয়েটেট ফোর্ডের কারখানায় হাত পাকানো ইনজিনিয়র অবনীশ ঘোষাল। পিপ্পলগড়ে ইস্পাত কারখানায় নিযুক্ত প্রধান ব্যক্তিদের একজন তিনি;

এবং সেই প্রসঙ্গে তাঁর দৈনন্দিন কর্মব্যস্ত জীবন, স্ত্রীর অলস ও সামাজিক দিনযাপন এবং উভয়ের অবসর বিনোদনের বর্ণনা প্রকট করে অবনীশের একান্ত নিঃসঙ্গতা, উসকে দেয় বিমূর্ত নারীর প্রতি প্রেম। বাস্তব অবাস্তবের মাঝামাঝি অবস্থিত সেই নারীর সঙ্গ পাবার বাসনা, অপ্রাপণীয় প্রেমের যন্ত্রণা, নিজস্ব ও নিরুপম জগতের জন্য আকুতি গল্পের প্রধান আকর্ষণ হলেও বৈভবকামী মানুষের কৃত্রিম জীবনযাপনের উল্লেখ, যান্ত্রিক রীতিনীতির টুকরো টুকরো প্রতিফলন পাঠের আকর্ষণ বাড়িয়ে দেয়।

গল্পটিতে আমরা দেখি অবনীশ বাবুর মনের অতৃপ্ত বাসনাকে। তাই গল্পটির শুরুতেই তার মুখে ধ্বনিত হয়— ''মাঝে মাঝে জানতে ইচ্ছে করে, তুমি কেমন আছো।''[১৯] এই তুমি হচ্ছে তার মনের প্রেরণা অর্থাৎ বিমূর্ত এক নারীর প্রতি প্রেম যে নারীর সঙ্গ পাবার জন্য সে একান্ত উৎসুক। গল্পটিতে কবি অতি সুন্দরভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের একটা জাল বুনেছেন। যে সম্পর্কে সবধরণের কর্তব্য পালন আছে, যে যার দায়িত্ব তা সুন্দরভাবে পালন করে যাচ্ছে কিন্তু কারোর জন্য কারোর কোন সময় নেই। তারা দুজনেই কর্মক্ষেত্রে সমাজের অতি গণ্যমান্য লোক। ঘোষাল সাহেব দৈত্যের মতো খাটেন। আটটা থেকে আটটা তাঁর রুটিন, অবনীশ বাবুর স্ত্রী মিলু একজন সমাজ সেবিকা— মজুরদের মধ্যে সাবালক শিক্ষার প্রচার, তাদের বৌদের হাইজীন শেখানো, ভূতপেত্নী নেই— এ ধরণের জ্ঞানদান, শিষ্যদের নিয়ে এসব কাজে তার দিন কাটে। পিপ্পলগড়ে উচু দরের সাহেবদের আমোদ উৎসবে তাঁদের দুজনের দেখা হয় অর্থাৎ তারা একসাথে সেখানে যায়। প্রায় রোজ রাতেই তারা নিমন্ত্রণ খায় বা খাওয়ায়, হঠাৎ যদি কখনো দুজনে একা বসে বাড়িতে খেতে হয় তখন দুজনেই আপ্রাণ চেষ্টা করে অস্বস্তি চাপা দিতে। তারা দুজন আবার পিপ্পলগড়ের

আদর্শ স্বামী-স্ত্রী বলে সম্মানিত। পার্টিতে যাওয়া আসার পথে মিলুকে পাশে নিয়ে যখন অবনীশবাবু গাড়ি চালান তখন তার মনে পড়ে সেই নারীর কথা এবং তার মনে হয় জিজ্ঞেস করতে— 'তুমি কেমন আছো', সে মনে করতে পারছিল না সেই নারীর সাথে তার দেখা কখন হয়েছিল—''তোমাকে শেষ দেখেছিলাম কবে? চল্লিশ বছর আগে? দশ বছর আগে? দু হাজার বছর আগে? গতকাল? ঠিক মনে পড়ে না। অনেকবার অনেক দেশে ঘুরে ঘুরে এখন ভুল হয়ে যায় কোনটা কোন দেশ, কোনটা কোন সময়, পাহাড়ের চুড়োয় বাংলোবাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে সমুদ্রে সূর্যাস্ত দেখেছিলাম সে কি ম্যানিলায়, না কাপ্রিতে? কোথায় সেই সরাইখানা যেখানে ছিলো গনগনে কাঠের আগুন, সেকেলে ও স্বল্প আসবাব, সুস্বাদু শাদাশিধে খাবার, স্নিগ্ধ মদ, আর বাইরে বরফ পড়া রাত্রি, নিশ্বসিত হিম অরণ্য? টিরল? ডেনমার্ক? না বিগসুর? আর সেই যেবার গাড়িতে যেতে যেতে তোমাকে দেখেছিলাম— সে কি মাইসোর থেকে উটকামণ্ডের পথে, না কানাডায়, না কি স্কটল্যাণ্ডে? ঐ রকমই কোথাও হবে— বা হয়তো অন্য কোথাও হতে পারে। যাচ্ছি গাড়িতে, ঠিক পাশে পাশে আর একটা গাড়ি চলেছে। উজ্জ্বল দিন, দুই দিকে বড়ো বড়ো গাছ, পথের উপরে আলোছায়াঁর খেলা। একটা নীল রঙের ইটালিয়ান ফিয়াট, সেটাটে তুমি। .....ভরা যোল তুমি, লাল জামা তোমার গায়ে, আলোর মতো আলো করে আছো সেই দিনটাকে। অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম তোমাকে, তারপর নীল ফিয়াট অন্য পথে বেঁকে গেলো।"[২০] এসবই আসলে তার মনের কল্পনা। তাইতো সে বলে— ''কোথায়? তুমি আছো কিনা তা-ই জানি না। কিন্তু এও কি সম্ভব যে তুমি মরে গিয়েছো? দিব্যরূপিণী, তুমি ও?"[২১] আসলে গল্পটিতে অবনীশ বাবুর কর্মব্যস্ত জীবনের একান্ত নিঃসঙ্গতা উসকে দেয় বিমূর্ত নারীর প্রতি প্রেম।

'প্রেমপত্র' ও অন্যান্য গল্প বুদ্ধদেব বসু রচিত শেষ গল্প গ্রন্থ। 'প্রেমপত্র'-তে আন্তজার্তিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাষাতাত্ত্বিক বিরূপাক্ষ রায় দুরদেশস্থ প্রেমিকার পাঠানো অদ্ভুত ভাষায় লেখা চিঠিটির যে মর্মোদ্ধার করতে পারলেন না জীবনের বহু বছর কাটিয়ে, সেই ব্যর্থ প্রয়াসের পটকথাই শুধু নয় গল্পটি, এক আত্ম সচেতন ধীমান ব্যাক্তির আত্মসমীক্ষাও বটে; সেইসঙ্গে জীবন ও জগতের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের চরিত্র নির্ণয়ের ভাষ্যও বলা যেতে পারে, যার উপরিভাগে রয়েছে ব্যাখ্যাতীত ও অপ্রাপণীয় প্রেমের কোমল আস্তরণ।

'জয়জয়ন্তী' গল্পে বুদ্ধদেব এক বিচিত্র প্রেমের আদল গড়েছেন। যেখানে গল্পের নায়ক সুমিত্র রীতিমতো একজন কবি, সে হুজুগের কবি নয়, যুগের কবিও নয়, নিছক কবি। গল্পটিতে আমরা দেখতে পাই গল্পের নায়িকা তন্দ্রার সাথে প্রথম সাক্ষাতের পর থেকেই তাকে সুমিত্রের এতই ভালো লেগেছে যে সে সব সময়ই তার কথা ভাবছে, তার সঙ্গেই আছে। তন্দ্রা এখন সুমিত্রের কবিতার অংশ হয়ে গেছে— ''যেমন করে একটি কবিতাকে ভালোবাসি, তেমনি করে তন্দ্রা, তেমনি করে ভালোবাসতে চাই তোমাকে। তুমি জানো না, তাই বার বার তা ব্যর্থ করে দাও, ব্যর্থ না করে উপায় নেই তোমার। তুমি কি তোমার দেহ থেকে বেরিয়ে আসতে পারো, তুমি কি একটি কবিতা হতে পারো তন্দ্রা?''[২২] সুমিত্র যখন জানতে পারলো যে সেও তন্দ্রার হৃদয়ে বাসা বেধে নিয়েছিল তখন সে মেনেও মেনে নিতে পারছিল না। তাই তার মুখে ধ্বনিত হয়— ''আমি বাসা নিয়েছি একটি দেহের মধ্যে; বিশ্বের কতটুকু আমার প্রাপ্য, তার বরাদ্দ বেঁধে দিয়েছে কয়েকটি ক্ষীণ ইন্দ্রিয়।''[২৩] গল্পটির শেষে গল্পকার অদ্ভূত এক সাসপেন্স সৃষ্টি করেছেন তাই গল্প শেষে মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন থেকেই যায় যে তন্দ্রা আর সুমিত্রের মিলন হল কি না?

বুদ্ধদেব বসুর আরেকটি অতি জনপ্রিয় গল্প হলো— 'প্রেমের বিচিত্র গতি'। গল্পটিতে একটি অসাধারণ এবং অতি সুন্দর ছোট্ট একটি প্রেমের কাহিনি বর্ণিত। পুরো গল্পটি ইলা আর শোভনের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত। ইলার বয়স কুড়ি এবং শোভনের ষোলো। ইলা অমলবাবুকে ভালোবাসে, সে যখন জানতে পারে যে অমলবাবু পামেলা নামক এক মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছে, তখন ইলা এ কথাটি কোনরকম সহ্য করতে পারছিল না। তাই সে শোভনকে পামেলার চেহারা সম্পর্কে নানা দোষ ত্রুটির কথা বলছিল। সে শোভনকে বলল যে পামেলার চেহারা অনেকটা মাগুর মাছের মতো, কি দেখে অমলবাবু তাকে বিয়ে করছেন। তারপর গল্পটিতে আমরা দেখতে পাই, ইলা কলকাতা ছেড়ে বিলেতে চলে যায় এবং যাওয়ার সময় শোভন ইলাকে বলে— ''সামনের বছর আইএসসি পাস করেই আমি বিলেত যাব। ফেরবার সময় আপনাকে নিয়ে আসবো সঙ্গে করে। যদি আসতে না চান, জোর করে ধরে আনবো।''[২৪] তারপর সে ইলাকে কথা দেয় যে বিলেত থেকে এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে এসে সে ইলাকে বিয়ে করবে। তারপর দেখা যায় চার বছর পর শোভন ইলাকে টেলিফোন করে বলে যে সে ফিরে এসেছে। ইলা মনে মনে শোভনের জন্য অপেক্ষা করছিল এই ভেবে যে শোভন ফিরে এসে তাকে বিয়ে করবে। তাই ইলা শোভনকে জিজ্ঞাসা করে তার মনে আছে কী যাওয়ার সময় সে ইলাকে কি বলেছিল। শোভন বলল হ্যাঁ মনে আছে ''আমি তোমাকে বিয়ে করব বলেছিলাম ছেলেবেলায় লোকে কী-ই না বলে।''[২৫] তারপর ইলা জানতে পারল যে শোভন মার্জারি নামক এক স্ত্রীলোককে বিবাহ করে ফেলেছে এবং তাকে নিয়ে সুখী আছে। এখানে ইলার দ্বিতীয়বার প্রেমের পরাজয় ঘটল। গল্পটিতে বুদ্ধদেব ছোট্ট একটি কাহিনির মধ্যে অতি সুন্দর প্রেমের আদল গড়েছেন।

বুদ্ধদেব বসুর 'তুলসীগন্ধ' গল্পে আছে এক বিবাহিত তরুণীর কথা আর 'একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা' গল্পে আছে অবিবাহিত ও প্রণয়ে অসার্থক এক তরুণের কথা। 'একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা' গল্প যেখানে শেষ হয়েছিল 'তুলসীগন্ধ' গল্প তারপর থেকে শুরু হয়েছে। নাম পালটেছে, কিন্তু ধাম বদলায়নি। ঢাকা শহরের প্রত্যন্তে এক তরুণ তার মাকে নিয়ে কুটির বেধে থাকত, থাকত প্রকৃতির মধ্যে উদাসীন হয়ে, এই তরুণ যুবকটির নাম হলো মৌলিনাথ, সে ইউনির্ভারসিটির প্রোফেসার ও খুব ভালো কবিতা লেখে।

গল্পটি দুটি পর্যায়ে বিভক্ত, যার প্রথম পর্যায়ে আমরা দেখি চিত্রা ও মৌলিনাথের কথোপোকথন। মৌলি নাথ এক কথায় জিনিয়াস কিন্তু কথাবার্তা চাল চলন একেবারে রুক্ষ। সে দশ বছর বয়সে শেকসপিয়র তর্জমা করেছে, তেরো বছরে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় এমন খাতা লিখেছে যে পাদ্রি পরীক্ষক ভেবে পাননি ছেলেটি জিনিয়াস না উন্মাদ, তেরো বছরে যা কবিতা লিখেছে তা পড়ে লোকে বিশ্বাস করতে পারছিল না যে এটি তার লেখা। চিত্রা মৌলিনাথকে তার কর্তব্য সম্পর্কে বোঝানোর চেষ্টা করে, কিন্তু কোন লাভ হয়নি। চিত্রা যখন জানতে পারে যে মৌলির হৃদয়ের কোন এক কোণে সে বাসা বেধেছে তখন তা চিত্রার কাছে মৌলির ছেলেমানুষি বলে মনে হয়েছে— ''তুমি অসাধারণ, তুমি প্রতিভাবান, তুমি অনেক বিষয়ে আমার চেয়ে অনেক বড়ো, কিন্তু তুমি যে ছেলেমানুষ সে কথাও সত্য।''[২৬] সে আবার বলে— ''আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি বলতেও বাধে না, কিন্তু তোমাকে স্নেহও করি মৌলি। তুমি যদি কোনদিন পৃথিবীতে কোনো মন্ত্র প্রচার করো আর তখনও যদি তোমার এ মন থাকে, আমি তোমারই শিষ্য হবো, দীক্ষা নেবো তোমারই কাছে— তোমাকে গুরু বলে মানতে এখনো

আমার আপত্তি নেই— কিন্তু সংসারে তুমি ছেলে মানুষ, তুমি আমার স্নেহের পাত্র— সেখানে, তুমি যা ভেবেছিলে তা হতে পারে না, তা হবার নয়।"[২৭] এ কথাটি বলে চিত্রা বিদায় নিল, মৌলিনাথও বলে উঠল— 'যাও যাও! জীবনে আর তোমার মুখ দেখতে চাই না আমি।"[২৮]

গল্পটির দ্বিতীয় পর্বে দেখি চিত্রারই ছোটবোন গীতা মৌলিনাথের অন্ধ-ভক্ত, সে তাকে পাগলের মত ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে। এক কথায় সে মৌলিনাথের ফ্যান। আবেগপ্রবণ হয়ে গীতা প্রায় প্রতিবাদী সুরে একদিন মৌলি নাথকে বলে— ''তুমি দাম্ভিক, তুমি স্বার্থপর, তুমি অন্ধ। ছেলেবেলা থেকে কাকে আমি দেবতার মতো পূজা করছি তা তুমি জানো? কার কাছে এসে একটু দাঁড়াতে পারলে সমস্ত দিনটা সার্থক মনে হয়েছে, তা কি জানো তুমি?"[২৯] গীতা আর বলতে পারল না, সে আবেগ প্রবণ হয়ে পড়ল। মৌলির মা-ও একবাক্যে গীতাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন। তখন মৌলি তার মাকে বলল যে গীতাকে সে ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে সে তার অনেক ছোট। মা ও মৌলির অনেক কথা কাটাকাটি হলো, শেষপর্যন্ত মা রাজি করাতে পারলেন না মৌলিকে। মৌলির চরিত্রের একঘেয়েমির জন্য সে গীতার মতো ভালোবাসার পাত্রীকে হারিয়ে ফেলল। সে গীতাকে ভালোবাসে কিন্তু তার ধারণা ভালোবাসা মানেই তো বিয়ে নয়। গীতা তাকে ছোটকাল থেকে ভালোবেসে আসছে তাই গীতার স্মৃতিচারণে পূর্বের হারানো সময়ের প্রতিধ্বনি শোনা যায়— ''এখনো মনে করতে পারি সেই গন্ধ— সে কি চায়ের, না চাঁপাফুলের, নাকি সেই সকাল বেলারই তা বলতে পারবো না, কিন্তু পৃথিবীর পৃথিবীর সমস্ত ভালো, সমস্ত সুন্দর আমার মনে আজ পর্যন্ত সেই গন্ধের সঙ্গে জড়ানো।"[৩০] এ গল্পের নায়ক মৌলিনাথ গীতার ভালোবাসাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং বাড়ি বদল করতে চায়। এ প্রবণতা তাঁর 'জয়জয়ন্তী'

গল্পের সুমিত্র, 'আবছায়া' গল্পের নায়ক, 'তুলসীগন্ধ' গল্পের নায়ক চরিত্রের মধ্যেও দেখা যায়।

'তুলসী গন্ধ' গল্পটি বুদ্ধদেব বসু পুরোনো স্মৃতি, ধূসর স্মৃতি, প্রেমের স্মৃতির গল্প হিসেবেই হয়তো লিখেছিলেন। ধূসর প্রেম আর রুক্ষ বাস্তব মিলেমিশে গিয়ে গল্পটি বেশ একটা অন্য চেহারায় হাজির হয়েছে। গল্পের নায়ক মিহির কুমার সোমের ঘুম ভাঙছে এক শীতের সকালে। ঘুম আর জাগরণের অর্ধ অবচেতনে তার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়। মানুষটি নিশ্চয় বিদগ্ধ মনের অধিকারী। তাঁর আলস্য, শীতের সকালে ঘুম ভাঙা বিছানায় তাঁর আরামের মৌতাত, পাশের বালিশ থেকে সদ্য উঠে যাওয়া তাঁর স্ত্রীর শরীরী অনুপস্থিতি মনের কোঠায় যা এখনো জড়ানো, কমলার শরীর তার সারবস্তু ওই ওখানেই, ওই মিহির কুমার সোমের শোবার বালিশের পাশেই ফেলে গেছে। কমলার মাথার বালিশের গর্ত আর গত রাতে তার মাথার চুলে মিহির কুমারের আঙুলের জড়ানো খেলার স্মৃতি এই শীতের সকালে তাঁকে তৃপ্তির চাদরে ঢেকে দিয়ে আচ্ছন্ন করে দেয় একেবারে। যে তৃপ্তিতে মিহিরের মন সোনালি উষ্ণ হয়ে উঠেছিল, 'দক্ষিণপশ্য আঙুরের মতো সোনালি তার অন্তর্নিহিত রস, তার উত্তাপ, তার প্রাণ কমলার সত্তার সচেতনতা, কমলার উপর তার পরিপূর্ণ অধিকারের অনুভব।"[৩১] কমলা মিহিরের এই নিজস্বতার বোধে কোনো অন্তরায় মিহির কুমার সোমের পক্ষে বেশ অচিন্তনীয়। কমলায় আচ্ছন্ন মিহির তার বিদগ্ধ মননে টের পেলেন যেন 'তার স্বেচ্ছাবৃত তন্দ্রায়, সদ্য পরিত্যক্ত স্বপ্নে অর্গ্যানের সুর-স্বর ঝরে পড়ছে।'[৩২] ঘুম ভেঙে যাচ্ছে, নিশ্চিতভাবে ভাঙছে, ওই অর্গ্যানের সুরে সেই ভাঙাকে সঁপে দিয়ে শেষ টেনেও তিনি টানেও রাখতে চাইলেন কমলাকে। সচেতনভাবে সত্তার অন্য অংশ দিয়ে

মিহির কুমার নিজেকে লিপ্ত রাখলেন কমলাতে। মিহির কুমার জানেন তাঁর কর্মস্থল বদলির সুবাদে সদ্য এসে পড়েছেন তিনি এই মফস্বল শহরে। এখানে মোটামুটি গুছিয়ে নেবার কাজও তার এখনো অনেক বাকি। তবু তিনি তার আলস্যকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবেন। এই উপভোগের প্রধান অবলম্বন কিন্তু ওই কমলা, কমলা যে তার, এই অধিকার বোধ থেকেই সে খুশি।

আসলে যৌবন ও প্রেম, বুদ্ধদেবের গল্পের মূল উৎস। সেই হিসেবে তিনি পরম রোমান্টিক। জীবনানন্দ দাস ও বুদ্ধদেব বসু দু'জনই রোমান্টিক কিন্তু জীবনানন্দ 'ঝরা পালক' বা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-তে যে সুদূর রোমান্টিক পরিসফর করেছেন, বুদ্ধদেব বসু সে তুলনায় অনেক বাস্তব ও ইন্দ্রিয়ঘন। বুদ্ধদেব বসু তাঁর গল্পে শরীর ও স্বাভাবিক কামনাকে কখনও অস্বীকার করেননি, প্রেম তার দেহগত ব্যঞ্জনা নিয়ে শিল্প হয়ে উঠেছে। বুদ্ধদেব বসুর গল্পের মতো উপন্যাসেরও মূল সুর হচ্ছে প্রেম। বুদ্ধদেব বসু প্রেমের উপন্যাস পছন্দ করেন, উপন্যাসে প্রেমকেই বড় করে দেখেন। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, রণেন্দ্র দেব প্রমুখ সকলে একথা বলেছেন। রণেন্দ্র দেব বলেন— 'বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের প্রধান সুর প্রেম। মানব মানবীর আকর্ষণ ও ভাববৈচিত্রের সন্ধানে তাঁর প্রথম উপন্যাস রচনা এবং এখন পর্যন্ত প্রেম তাঁর মুখ্য অন্বিষ্ট।'[৩৩] গোপিকানাথও বলেছিলেন, ''কবিতা, গল্প, উপন্যাস সর্বত্রই তিনি প্রেমের এক আশ্চর্য রূপকার। প্রেমের লাবণ্য ও দীপ্তি, প্রেমের মোহমদির স্বপ্নাবেশ ও বেদনার সুর সবই বুদ্ধদেবের কবিতার মতো গল্প ও উপন্যাসের নায়ক নায়িকার জীবনকে ঘিরেও বিচিত্র রঙে রসে উন্মোচিত হয়েছে।''[৩৪] গোপিকানাথ আরো বিশদ করে বলেন— প্রেমের গল্পে 'ব্যক্তির মনস্তত্ব, ব্যক্তির সম্পর্ক, ব্যক্তির হৃদয়ের গূঢ় গভীর পিপাসা ও আর্তি বড়ো হয়ে

ওঠে।' বুদ্ধদেবের 'তিথিডোর' (১৯৪৯) উপন্যাসের নায়িকা স্বাতীর প্রেম বিকশিত হয় তরুণ অধ্যাপক সত্যেনের সংস্পর্শে। এ উপন্যাস কৃত্রিম ভাবোচ্ছাস বা দেহ লালসার বিকার মুক্ত।

বুদ্ধদেব বসুর গল্পের মতো উপন্যাসেরও অনেক নায়করাই কবি কিংবা শিল্পী। সাগর, সৌমেন, মৃগাঙ্ক, রঞ্জন, নীলকণ্ঠ, মিহির, মৌলিনাথ সবই কবি, তারা পৃথিবী ও মানুষকে দেখে, রোমান্টিক কবিত্বের দৃষ্টিতে। 'যেদিন ফুটলো কমল'— এ পার্থ প্রতিমের সঙ্গে শ্রীলতার অন্তরঙ্গতা হল— কাব্যময় আত্মলীন প্রেম যা দীর্ঘকাল ছোট নীল রঙের ঘরে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। 'ধূসর গোধূলি'-র নীলকণ্ঠ ব্যর্থ প্রেমিক ও কবি। তার খুড়তুতো বোন অপর্ণা, নীলকণ্ঠের চোখে তার সৌন্দর্য যেন 'স্বপ্নময় অবাস্তবতা'। 'তিথিডোর'-এ সত্যেন ও স্বাতীর প্রেম যেন মৃদু আলো দিয়ে গড়া, ছায়া স্বপ্নের জগতে উধাও হওয়া। 'সূর্যমুখী' উপন্যাসের মিহির বিয়ে করল মৃণালকে, জৈব আকর্ষণে পেলো সূর্যস্বাদ। 'দুই ঢেউ এক নদী' একই পরিবারের দুই ভাইবোনের প্রণয় কাহিনী। 'শেষ পাণ্ডুলিপি'-র বীরেশ্বর দুর্দান্ত, উচ্ছৃঙ্খল লেখক যে বাল্য প্রণয়িনী, সম্প্রতি বিমাতা গৌরীকে পেয়ে লালসামগ্ন। আর আছে কলেজ বন্ধু, কিন্তু সম্প্রতি অফিস-বস প্রফুল্ল ও তার স্ত্রী অর্চনার সম্পর্ক। বীরেশ্বর অর্চনার প্রতি দেহ কামনায় নির্লজ্জ। শেষপর্যন্ত মোটর দুর্ঘটনায় প্রফুল্ল অর্চনার মৃত্যু, বীরেশ্বরের মস্তিষ্ক বিকৃতি, আত্মহত্যা— এ সবই বুদ্ধদেবের অতুলনীয় রীতির পরিচায়ক।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিতা, গল্প, উপন্যাস সর্বত্রই প্রেমের পাপড়িমেলা, সুরভি বিস্তার সার্থকভাবেই উপস্থিত করতে পেরেছেন। বুদ্ধদেবের গল্পে প্রাধান্য পায় এক স্বপ্নিল ভীরু প্রেম, মার্জিত রুচির মানুষের পরিশীলিত প্রেম, প্রেম যা

ব্যবহারিক, রোমান্টিক প্রেমের মনোজগতের সূক্ষ্ম সৌকুমার্যের নানাবিধ বর্ণিলতা ইত্যাদি বুদ্ধদেবের গল্পে প্রেমের সমস্যা ও সংকটবিন্দুগুলি জোরালো নয়, নানা বৈপরীত্যে মেশা। বুদ্ধদেব বসুর গল্পে প্রেমের জাগরণ বাস্তব, প্রাত্যহশ্লিষ্ঠ ও শরীরী। অন্যদিকে, তা অশরীরী এক ভাববস্তু, কায়াহীন এক ভাবজ্যোতি-দেহহীন চামেলির লাবণ্য বিলাস। আদর্শের দিক থেকে অথবা তত্ত্বের দিক থেকে এই প্রেম অবাস্তব।

ছোট্ট একটি পরিসরে বর্ণিত গল্প 'একটি কি দুটি পাখি'। গল্পটিতে বুদ্ধদেব বসু অতি সাধারণ ভঙ্গিতে খুব সুন্দরভাবে নায়কের মুখ দিয়ে তার প্রেমের কাহিনী বর্ণনা করেছেন— ''আমার সেই সুদূর সতেরো বছরে পাখি আমাকে ভালোবেসেছিলো। ...কথা বলতে বলতে এমন করে মনে পড়ছে তাকে, যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। কালো মেয়ে; কালো দুটি চোখ। চোখে চোখেই ভালোবাসার জন্ম, চোখে চোখেই তার জীবন। সকলের সঙ্গে সকলের গল্পগুজবের মধ্যে আমি বসে থাকতাম সেও থাকতো— মনেই করতে পারি না যে দু'জনে দু'জনকে সোজাসুজি কিছু বলেছি, সেই না বলাটাকেই মনে হতো বেশি বলা, তাতেই ভরে থাকতো দিনরাত্রি।''[৩৫] মিস্টার চ্যাটার্জি তপন সরকারের কাছে তার প্রেমের কাহিনী খুলে বলছেন। গল্পটিতে নায়কের জীবনে তার প্রেমিকা যার নাম পাখি সে এখন নেই কিন্তু মিস্টার চ্যাটার্জির মনে পাখি এখনো বিরাজ করছে। সে তাকে কখনো ভুলেনি বা ভুলতে পারেনি। তার বারবার পুরোনো কথাই মনে পড়ে একদিন তারা গিয়েছিল থিয়েটার দেখতে আসার সময় পাখির সাথে খোলাখুলি তার প্রথম পরিচয়, আর সেই রাতটিকে মিস্টার চ্যাটার্জি কখনো ভুলতে পারেনি।

আর একদিনের কথা মনে পড়ল তার। কলকাতায় তার দাদার বাড়িতে পাখি দু'দিনের জন্য এসে উঠেছিল, পরের দিনই আবার চলে যাবে পাখি স্বামীর কাছে। সেই রাতে পাখি তার কাছে এলো, কয়েক মিনিট চুপ করে বসে রইলো, তারপর আবার যাওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল। এমন সময় কি যেন ভেবে সে বলে উঠল— ''তোমার আলোটা নিবিয়ে দিয়ে যাই— এক ফুঁয়ে নিবে গেলো বাতি একটু ধোঁয়া, কেরোসিনের গন্ধ একটু, ঘরে জেগে উঠলো নীল জ্যোৎস্না ম্লান হলো শাড়ির ঘন-নীল, মুখে নামলো ছায়া, চোখের কালোতেই চোখ ডুবে গেল, শুধু ঠোট দুটি আকা হয়ে রইলো চাঁদের আলোয়। এক মুহূর্ত তাকে দেখলাম ওরকম, তারপর আমার পাশ দিয়ে চলে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালো, চকিতে ফিরে সে দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলো আমাকে, ঠোটের উপর চুম্বন করে বললে— এর বেশি আমি আর তোমাকে দিতে পারি না।''[৩৬] সেই মধুরতম মুহূর্তকে ভাবতে ভাবতে মিস্টার চ্যাটার্জি সে রাতে আর ঘুমোতে পারেন নি। তার মনে হয়েছিলো পাখি আবার আসবে তার কাছে, কিন্তু সে আর এলো না। গল্পটিতে বুদ্ধদেব বসু পুরোনো স্মৃতির বর্ণনার মাধ্যমে ছোট্ট একটি প্রেমের কাহিনী উল্লেখ করেছেন। বুদ্ধদেব বসু তাঁর প্রেমের গল্পগুলোতে অনেক নতুন নতুন পর্যায় দেখিয়েছেন যেমন 'অভিনয় নয়' গল্পের প্রেমচতুর নায়ক প্রতুলের কাছে নায়িকা রমা মূর্তিমতী প্রহেলিকা। রমার প্রণয়কলার মূল্য নিরূপণে যখন প্রতুলের বিদ্যাবুদ্ধি-চাতুর্য সমস্তই ব্যর্থ, তখন রমার অন্তরুন্মীলনে সহায়তা করল শিশির ভাদুড়ীর সীতা নাটকের অভিনয়। সীতা-রামের প্রণয়মহিমার শিল্প সৌন্দর্যে তন্ময়ীভূতা রমার ব্যক্তিত্ব শিল্পের সাধারণীকৃতির প্রভাবে চিরন্তনী নারীসত্তায় বিগলিত হল। শিল্পই জীবনকে সার্থকতার পথ দেখাল।

নাগরিক জীবনের শিল্পী হলেন বুদ্ধদেব। নাগরিক সভ্যতার আশীর্বাদ ও অভিশাপ দুই-ই আছে। অসংখ্য সমস্যাভারে জটিল সে জীবন। কিন্তু বুদ্ধদেব তলিয়ে গেছেন মানুষের মানষলোকে। নরনারীর মন-দেয়ানেয়ার রহস্যই তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। তাই র্তার গল্প উনন্যাসে চিরকালীন চিরপুরাতন বিরহ-মিলন কথারই নব-নব রূপায়ণ। এক কথায় তাঁকে প্রেমের শিল্পী বলা যেতে পারে। প্রেম কথাটিকে প্রচলিত ও সীমাবদ্ধ অর্থ থেকে মুক্তি দিয়ে নরনারীর দেহ ও হৃদয় বিনিময়ের ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রসারিত করেই প্রেমের শিল্পী কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সম্ভোগ ও সুখবাদী নারীপুরুষের সম্পর্ক যেমন বৈচিত্র্য তেমনি জটিলতা নিয়ে মানুষের কাছে দেখা দিয়েছে। সভ্যতার আদিতে যা কেবল জৈবসৃষ্টির প্রেরণামাত্রই ছিল আধুনিক মানুষের কাছে তার নানা অর্থ, নানা তাৎপর্য। বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যে প্রেমের বিচিত্র গতির শিল্পিত রূপ পরিদৃশ্যমান কিশোর-কিশোরী লীলায় স্বপ্নকামনা থেকে শুরু করে সুখবাদী মানুষের রতি ও বিরংসার নগ্নচিত্র যেমন তিনি অঙ্কন করেছেন তেমনি বন্দনা করেছেন ত্যাগে ও আত্মনিবেদনে মধুর ও সুন্দর প্রেমের মহিমাকে।

'দু-একটা স্বর'-এর স্ত্রীর কণ্ঠ নীরব। কিন্তু 'দাম্পত্য আলাপ'-এ স্ত্রী ও গল্পের রসপরিবেশনে সহযোগিনী। প্রাগবিবাহ যুগের প্রেমিকার স্মৃতি-তর্পনে স্ত্রীও সুরুচিসম্পন্ন রসিকতার সাহায্যে স্বামীর রসোদগারে সহায়তা করেছে। এখানে প্রেমের রূপটি যেমন নয়নাভিরাম শিল্পায়ণও তেমনি মধুস্বাদী। প্রেম এখানে একটি আনন্দচেতনামাত্র। যেমন ভোর বেলায় আধো ঘুমের স্বপ্ন, তার আকার নেই, শুধু আকুলতা আছে। সে ছবি কার কেউ জানে না। কোনো ব্যক্তির সঙ্গে প্রেমে পড়ার

অবস্থা এটা নয়, এটাকে বলতে পারো প্রেমের সঙ্গেই প্রেমে পড়া।

কিন্তু এই 'প্রেমের সঙ্গেই প্রেমে পড়া' স্থূল ভোগবিলাসী মানুষের কাছে তাৎপর্যহীন। শিল্পবিপ্লব পরবর্তী ধনতান্ত্রিক নাগরিক জীবনের এই ভোগসর্বস্ব সুখবাদ আধুনিক সভ্যতার একটি চরম অভিশাপ। এই ভোগবাদের অভিশাপ এই নির্বিচার নগ্নচিত্র বুদ্ধদেব উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কন করেছেন। ক্ষোভের বিষয়, এরজন্য সমাজের নিকট যে সাধুবাদ তার প্রাপ্য ছিল, তা তো তিনি পানইনি, উপরন্তু এই 'লালসার অসংযম'কে সাহিত্যে শিল্পিত রূপ দেবার অপরাধে তিনি নিন্দিত ও ভর্ৎসিতই হয়েছেন, এমনকি তাকে জেলও কাটাতে হয়েছে। কিন্তু একটু ভিতরে গিয়ে বিচার করলে বুঝতে পারা যায় যে, নাগরিক জীবনে অবাধ প্রেমের চিত্র আকতে গিয়ে বুদ্ধদেব সুখবাদী মানুষের কথা বারবারই বলেছেন বটে, কিন্তু তাঁর সাহিত্যের ফলশ্রুতি সর্বদাই সুখবাদের বিরুদ্ধে। এদিক দিয়ে উপন্যাসে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে 'যবনিকা পতন'। দুর্ভাগ্যবশত গ্রন্থখানি তার উপযুক্ত সমাদর থেকে আজও বঞ্চিত। হয়ত এ গ্রন্থে বর্ণিত নিষিদ্ধ দেহমিলনের চিত্তাকর্ষক বর্ণনাই নিম্নরুচির পাঠকের কাছে সবচেয়ে উত্তেজক বলে মনে হবে, কিন্তু যাদের মননশীল চিত্তে সাহিত্যের সত্যকার আবেদন ব্যর্থ হয় না তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, অবাধ সম্ভোগবাদের বিরুদ্ধে এই গ্রন্থ বুদ্ধদেবের বলিষ্ঠতম প্রতিবাদ। আত্ম-সুখপরায়ণ মানুষের হাতে শুভবুদ্ধির যে অপমৃত্যু এই গ্রন্থের ট্র্যাজিক পরিণামকে রূপায়িত করে তুলেছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা নেই।

বুদ্ধদেবের প্রেমের গল্প অনেক সময় শুধু রোম্যান্টিক নয়, তা রোমান্সের ভাবাকুল ইচ্ছাপূরণের গল্পে পর্যবসিত হয়েছে। 'একটি লাল গোলাপ' গল্পে

প্রেমিকার হাতে নামহারা প্রেমিকের অর্ঘ্য পৌছে যায়। লাল গোলাপটি প্রতীক হিসাবে প্রেমের জাগরণ ঘটিয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর গল্পের বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রেমই প্রধান এবং প্রেমের গল্পেই তিনি সার্থক হয়েছেন সবচেয়ে বেশি এই মত অধিকাংশ সমালোচকের। তাঁর প্রথম জীবনের গল্প গ্রন্থ 'অভিনয়, অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প' থেকে দু'টি প্রেম উপজীবী গল্প বিশ্লেষণ করা যাক। 'প্রথম ও শেষ' গল্পের লীনা প্রেম সম্পর্কে একটি উচ্ছ্বাসময় অতিরেকী ধারণা পোষণ করে। প্রেম বাস্তব পৃথিবীর ধূলি সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকবে, সেই প্রেম যখন আবির্ভূত হবে তখন সবকিছু বিস্মৃত হয়ে নিজেকে সে সমর্পণ করবে— এই তার বাসনা। নীল রক্তের এই অভিজাত পুরুষকে দেখামাত্রই সে হৃদয় দান করে। তারপরেই অসুস্থতায় তার প্রেমিকের মৃত্যু ঘটে। এই গল্পগ্রন্থে দেখা যায়— এক বছরের মধ্যেই সেই রোমান্টিক নীলা অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করে এবং আর পাঁচজনের মতোই সংসারী হয়— এই মন্তব্য করে গল্প শেষ করেছেন লেখক। পরে অবশ্য ১৯৪৫-এ প্রকাশিত 'গল্প সংকলন'-এ এই গল্পটি সন্নিবেশ করার সময়ে বুদ্ধদেব এই একান্ত বাস্তব-রূঢ়তা স্পর্শী প্রেম-বিরোধী সমাপ্তি অংশটি বর্জন করেন। কিন্তু ১৯৩০-এ এই জাতীয় অতি রোমান্টিক প্রেম সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী তির্যক বলেই মনে হয়। আর একটি গল্প 'অভিনয় নয়'। এই গল্পে প্রতুল ভালোবাসে আধুনিকা তরুণী রমাকে— যে প্রেমকলায় কারুশিল্পী। টেনিস খেলে, পিয়ানো বাজিয়ে, লনে বেড়াতে বেড়াতে সন্ধ্যাতারা দেখেও রজনীগন্ধার ঝোপের ধারে হাতে হাত রেখে বসে থেকে প্রেম কিছুটা এগোয়, তারপর থেমে থাকে। রমার মন জয় করার জন্য প্রতুল তাকে দেখাতে নিয়ে আসে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর 'সীতা' নাটক। রমা মুগ্ধ হয়ে আত্মহারা হয়ে প্রতুলকে গ্রহণ করে। এই গল্প দু'টিতেই প্রেম সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর ধারণার

মধ্যে একটি অবিশ্বাসী ও পরিহাসময় মনের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। আগা গোড়াই গল্পটিতে প্রতুলের দৃষ্টিতে রমাকে উপহাসের উপকরণরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

১৯৩২-এ প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর 'এরা ওরা এবং আরো অনেকে'র অন্তর্গত সবকটি গল্পই তথাকথিতভাবে প্রেমের গল্প। উচ্চবিত্ত, ইংরেজি শিক্ষিত, দক্ষিণ কলকাতার তরুণ-তরুণীর মেলামেশার কাহিনী। এই গল্পগুলোর চরিত্রগুলোর মধ্যে প্রেম সম্পর্ক গড়ে ও ভাঙে। একটি মুহূর্তে একটি চরিত্র প্রেমে আবিষ্ট, অল্প সময় পরেই তার মন বিপরীতমুখী। প্রেমাবেশের মধ্যে প্রায় সবসময়েই কিছু দ্বিরাচার লক্ষণীয়। একটি গল্পের নায়িকার নাম লুসিললিতা। এক চিত্রশিল্পী তাকে ভালোবাসে মুগ্ধপ্রহর যাপন করে তার নাম ধ্যান করার মধ্য দিয়ে। অপর আরেকটি গল্পে রূপবান নায়ক এক সরলা কিশোরীর প্রতি অনুরক্ত হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফিরে আসে এক বিত্তশালিনী নাগরিকা নায়িকার বন্ধনে। তথাকথিত আধুনিক তরুণ-তরুণীদের প্রেমে বুদ্ধদেবের অবিশ্বাসের ভাব প্রবল ও আন্তরিক। এই সমাজের নরনারী নিয়ে আরো কেউ কেউ নিখেছিলেন তাঁর আগেও সমকালে কিন্তু তাঁরা কেউই এ জাতীয় চরিত্রের পারস্পরিক ভালোবাসায় ফাঁকি স্বার্থপরতার দিকটা বড় করে দেখতে চাননি তাঁরা শুধু অভিব্যক্ত করেছেন প্রেমের শুদ্ধতা। রবীন্দ্রনাথ ও 'শেষের কবিতা'র (১৯২৯) নিমি, সিসি, কেটিদের অন্তরে সত্যিকারে প্রেমের উজ্জ্বলতাই দেখেছিলেন।

বুদ্ধদেব বসুর গল্পে প্রেমানুভব বারবার রূপ পায়। প্রেমকে তিনি কোনো দৃঢ়, গঠনমূলক, সুপরিণামী মনোভাবরূপে দেখার কথা ভাবেননি। প্রেম তাঁর কাছে নরনারীর সম্পর্কের একটি অত্যন্ত সাময়িক উচ্ছ্বাস তরঙ্গ। তা তীব্র কিন্তু মোহময়,

তা গভীর হতে পারে কিন্তু বাস্তব সংসারের পরীক্ষায় তাকে কখনো ফেলা হয় না। তা ততটা সত্য নয়, যতটা স্মৃতি। এজন্যই যে সব গল্পে প্রেমকে তিনি প্রধান ও প্রবলভাবে দেখিয়েছেন তা সর্বত্রই অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এক আবেগ, কোনো সময়েই তার পরিণতিতে কোনো স্থিতি নেই— বিচ্ছেদই তার স্বাভাবিক পরিণাম। 'প্রথম ও শেষ', 'এমিলিয়ার প্রেম', 'অপমান না অভিমান', 'আদর্শ', 'সবিতা দেবী' ইত্যাদি নানা পর্বে লেখা গল্পে প্রেমের এই বিচ্ছেদ-স্বাভাবিক রূপ তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। 'অপমান না অভিমান' গল্পের ভিন্ন সমাজের অধিবাসী দু'টি ছেলেমেয়ের অকথিত এবং পরস্পরের কাছে অনুদ্ঘাটিত সম্পর্কের কারুণ্য পাঠককে স্পর্শ করে। বাহুল্যের চাপে নিরর্থক হয়ে যেতে যেতেও 'সবিতা দেবী' গল্পে পনেরো বছরের বড় এক রমণীর প্রতি যুবক নায়কের একনিষ্ঠ প্রেম অনেকটা সত্য হয়ে ওঠে। নায়িকার অসহায় প্রত্যাখ্যানও এখানে অনেকটা স্বাভাবিকভাবেই আসে। বুদ্ধদেব বসু এভাবেই তাঁর গল্পগুলোতে প্রেমের নানা প্রবণতা উদঘাটিত করেছেন— কখনও প্রেমকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন কখনো কোন রক্ত-মাংসের নারীর সৌন্দর্যে আবার কখনো ছোটখাটো কাহিনিতে।

# তথ্যসূত্র


১। গুণ সুমন/ বুদ্ধদেব বসু অশ্লীলতার সঙ্কট/ 'রজনী হলো উতলা'/ এবং মুশায়েরা/ ২০০৯/ পৃ-৩১

২। তদেব/ পৃ-২৭

৩। তদেব/ পৃ-২৭

৪। তদেব/ পৃ-২৭

৫। বসু বুদ্ধদেব/ বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠগল্প/ 'আবছায়া'/ সুধাংশুশেখর দে/ দেজ/ ২০০০/ পৃ-১১১

৬। তদেব/ পৃ-১১৩

৭। মজুমদার সমরেশ গল্পকার বুদ্ধদেব বসু/ বুদ্ধদেব বসু বৈচিত্র্যের নানা মাত্রা/ ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় ও ঋষি ঘোষ/ রত্নাবলী/ ২০১০/পৃঃ-৪১৬

৮। তদেব/ পৃ-৪১৬

৯। তদেব/ পৃ-৪১৬

১০। তদেব/ পৃ-৪১৬

১১। তদেব/ পৃ-৪১৭

১২। তদেব/ পৃ-৪১৭

১৩। তদেব/ পৃ-৪১৭

১৪। তদেব/ পৃ-৪১৭

১৫। তদেব/ পৃ-৪১৮

১৬। তদেব/ পৃ-৪১৮

১৭। তদেব/ পৃ-৪১৯

১৮। তদেব/ পৃ-৪১৯

১৯। বসু বুদ্ধদেব/ ভাসো আমার ভেলা/ 'তুমি কেমন আছো'/ এবং মুশায়েরা/ ২০১০/ তদেব/ পৃ-৪১৭

২০। তদেব/ পৃ-৪২০

২১। তদেব/ পৃ-৪২০

২২। বসু বুদ্ধদেব/ বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্টগল্প/ 'জয়জয়ন্তী'/ সুধাংশুশেখর দে/ দেজ/ ২০০০/ পৃ-১৮১

২৩। তদেব/ পৃ-১৮৪

২৪। বসু বুদ্ধদেব/ ভাসো আমার ভেলা/ 'প্রেমের বিচিত্র গতি'/ এবং মুশায়েরা/ ২০১০/পৃ-১০৭

২৫। তদেব/ পৃ-১০৮

২৬। বসু বুদ্ধদেব/ ভাসো আমার ভেলা/ 'একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা'/ এবং মুশায়েরা/ ২০১০/ পৃ-২৬৫

২৭। তদেব/ পৃ-২৬৫

২৮। তদেব/ পৃ-২৬৬

২৯। তদেব/ পৃ-২৭৩

৩০। তদেব/ পৃ-২৭১

৩১। বসু বুদ্ধদেব/ ভাসো আমার ভেলা/ 'তুলসী গন্ধ'/ এবং মুশায়েরা/ ২০১০/ পৃ-১০৯

৩২। তদেব/ পৃ-১০৯

৩৩। দেব রণেন্দ্র/ বাংলা উপন্যাসে আধুনিক পর্যায়/ পৃ-২১৯

অক্টোবর ১৯৬৪/ বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড।

৩৪। বসু বুদ্ধদেব/ কল্লোলের কথোকোবিদ— বাংলা কথাসাহিত্যে প্রসঙ্গ, পৃ-৯৪১

৩৫। বসু বুদ্ধদেব/ ভাসো আমার ভেলা/ 'একটি কি দুটি পাখি'/ এবং মুশায়েরা/ ২০১০/ পৃ-২৭৭

৩৬। তদেব/ পৃ-২৮১